আকাশ পাতাল

কৃষ্ণা গুহঠাকুরতাকে

১

বারোজন বৃদ্ধ আর একটি শিশু। রেলের কামরার একদিকের দুটো বেঞ্চ জুড়ে বসেছে ওরা, ছোট কামরায় যথেষ্ট ভিড়, আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। বারোজন বৃদ্ধ ও একটি শিশু মিলে ওরা একটি দল, ওরা হুমড়ি খেয়ে সবাই তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে দ্রুত অপসৃয়মান নদী-নালা, গাছপালা, মাঠ-ঘাট দেখছে অতিশয় ব্যগ্রভাবে, ক্ষণে-ক্ষণে মুগ্ধ হয়ে উঠছে। ওদের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন, কিন্তু চোখ আনন্দে উজ্জ্বল। বারোজন বৃদ্ধের এক সঙ্গে এই প্রকৃতিপ্রীতি দেখে আমার একটু অবাকও লাগল। বার্ধক্যে সবই পুরোনো হয়ে যায়, প্রকৃতিও কি পুরোনো হয়না?

শিশুটি চুপ করে আছে, আর সেই বারোজন বৃদ্ধই মন্তব্যে মুখর। 'যাওয়ার সময় তো এই খালে এত পানি দেখি নাই।' 'মাটির রং দেখো না বেশ কালচে মেরেছে– এবার ধান ভালো হবে! যাই বলো আর তাই বলো, এমন সবুজ ঘাস আর কোথাও দেখতে পাবেনা।'

আমি অতিশয় কৌতূহলে ওদের কথা শুনছিলাম। এমন সময় একজন বৃদ্ধ আমাকে বললেন, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! আপনি বসুন বাবুমশাই, আমি দাঁড়াই!

শশব্যস্তে আমি বললুম, না, না, তা কি হয়! আমি ঠিক আছি, কোন অসুবিধে হচ্ছেনা, আপনি বসুন।

বৃদ্ধটি তখন সীটের তলা থেকে একটা পুঁটুলি বার করে নিজে তার ওপর বসে—আমাকে একটু জায়গা করে দিলেন। আমি ওঁদের মাঝখানে বসলুম। বৃদ্ধ বললেন কদ্দিন পর দেখছি এই দেশ, আর যে দেখব কখনো সে আশা তো নাই। তাই এত ভালো লাগতেছে।

জিজ্ঞেস করলুম, আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রশ্নের অপেক্ষামাত্র, এক সঙ্গে অনেকে উত্তর দিলেন। কথা বলার জন্য ওঁরা সবাই টগবগ্ করছেন। বুকের মধ্যে জমা অফুরন্ত গল্প।

ঐ বৃদ্ধের দল মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন। মক্কা-মদিনা ঘুরে প্রায় সাত-আটমাস বাদে আবার দেশে ফিরছেন—বাঁকুড়া জেলার এক গণ্ডগ্রামে। কী সরল বিস্ময়কর ওদের অভিজ্ঞতা। ঐ বারোজনের মধ্যে ন-জন আগে কলকাতা শহরই দেখেননি, নিজের গ্রাম ছাড়া শহর বলতে দেখেছেন বাঁকুড়া সদর, জমিজিরেত

কাবাদর্শন, মদিনা—একসঙ্গে এতগুলো অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা ওঁদের চোখে-মুখে। সারাটা জীবন একরকম কাটিয়ে গ্রামের ধুলো-কাদায়, অন্ধকারে কাটিয়ে হঠাৎ বাইরে সারা পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ার চমক সত্যিই আন্দাজ করা শক্ত।

আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। কত টাকা লাগল? জাহাজ ভাড়া সাড়ে-সাতশো টাকা! কিন্তু সব মিলিয়ে তিন হাজার টাকার মতন খরচ পড়েছে এক-একজনের। একজন গ্রাম্য চাষীর পক্ষে তিন হাজার টাকা খরচ করা কম কথা নয়। টাকা থাকলেও সবাই যেতে পারেনা—সরকারি হজ দপ্তরে আগে থেকে নাম লেখাতে হয় যাদের নাম আগে থাকে তারাই সুযোগ পায়। ওঁরা অনেকে জমিজায়গাও বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেছেন—বৃদ্ধ বয়েসে তীর্থযাত্রা, অচেনা দেশ আর সমুদ্রের পথ—পথে রোগশোকের সম্ভাবনা আছে। ফেরার ভরসা না-করেই বেরিয়েছিলেন—তীর্থের পথে কিংবা তীর্থস্থানে মৃত্যু—সে তো পরম পুণ্য। কিন্তু দলের কেউ মরেনি সবাই ঠিকঠাক বেঁচে আবার ফিরে এসেছে, এখন আবার দেখতে পাবে নিজের গ্রামখানি—এই এক অপ্রত্যাশিত আনন্দ।

ভারত সরকার প্রত্যেককে ৩০ কেজি চাল সঙ্গে করে নিতে দিয়েছে, দিয়ে দিয়েছে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশান, মক্কায় ডাক্তার পাঠিয়েছে। মক্কায় লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিড়, সারা পৃথিবী থেকে এসেছে তারা, বাড়ি ভাড়া অগ্নিমূল্য, তাঁবুতে থেকেছে অনেকে, জলের সংকট, কুরবানির জন্য একেকটা ছাগলের দাম একশো-দেড়শো টাকা—কিন্তু এসব কষ্ট সহ্য না করলে তীর্থের ফল ফলবে কেন? মক্কায় খুব ভিড়—কিন্তু মদিনা—সে বড় দিব্য আনন্দের জায়গা। ওদের মুখ থেকে আমি শুনতে লাগলুম, মদিনায় কী শান্ত নিরালা ভাব, সেখানে গেলে মানুষের মন থেকে লোভ-হিংসা লোপ পায়—এমনকী ক্ষুধাতৃষ্ণাও কমে যায়। হজরত সাহেবের প্রিয় স্থান সেই মদিনা।

জিজ্ঞেস করলুম বড়মিঞা সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বলতেন কী করে? আপনারা বাঙালিমুসলমান—আপনারা কী আরবি-ফার্সি জানেন?

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বললেন, না বাবুমশাই, ওসব আমরা জানিনা। বাংলা কথা জানি তাও লিখতে-পড়তে জানিনা। মুখ্যুসুখ্যু লোক—আমাদের কালে কী আর এত পাঠশালা-মাদ্রাসা ছিল!

—তবে সেখানে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন কী করে?

—এই যে এই আঙুল দেখিয়ে। দোকানদার যদি দশটাকা দাম বলে তো দশটা আঙুল দেখায়—আমি বলি ছ-টাকার বেশি দেবনা আমি দেখাই ছ'আঙুল। বাংলাও বোঝে দু-চারজন।

—বাংলা বোঝে ?

—হে' সেই তো আশ্চর্যি ! মাঝে-মাঝেই দু-একটা লোক বেশ দু'-চার কথা বাংলায় বলে ! ফি বছরই তো যাচ্ছে আমাদের এই বাংলা দেশ থেকে অনেকে—শিখে নিয়েছে ওরা। একেকটা দোকানি আটটা-দশটা ভাষায় গড়গড়িয়ে বলে যায়—ইংলিশও জানে পর্যন্ত।

—অতদূর দেশে হঠাৎ বাংলা শুনে কেমন লেগেছিল ?

—সত্যি কথা বলতে কী, নিজের দেশের কথা না-শুনে প্রাণটা জুড়োয় ? ঐ আপনার বাংলা কথা আর যেদিন মাছ পেলাম—একটাকা-দেড়টাকা সেরের টাটকা মাছ—তখন যা আনন্দ হইছিল।

ছোট ছেলেটি জানলায় থুতনি রেখে সেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাইরে। বছর নয়-দশ বয়েস, মিষ্টি মুখখানি। যে বৃদ্ধ আমার জন্য বসার জায়গা করে দিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম ঐটুকু ছেলেকেও আপনারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

বৃদ্ধ সস্নেহ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, উটি আমার নাতি। ওকে আর কোথায় রেখে যাব। ওর বাবা-মা মরেছে পিঠোপিঠি বছরে—আমি ছাড়া এ সংসারে ওর আর আপনজন নাই, ওরে আর কোথায় রেখে যাই কন।

তারপর আমার দিকে মুখটা এগিয়ে এনে গোপনকথা বলার ভঙ্গিতে বললেন ইচ্ছেটা কী ছিল জানেন ? আর ফিরে আসবনা। আমার নাতি ঐ আলিজানকে আরো নিয়েছিলাম সেই জন্য। আমার তো দিন শেষ হয়ে এসেছে, শেষের দিনটা মক্কাতেই কাটিয়ে দেব। আমি মরলে আলিজানেরও তিনকূলে কেউ থাকবেনা—ও ওখানেই থেকে যাবে।

—তাহলে ফিরে এলেন কেন ?

—পারলামনা। সারাজীবনটা কাটল হেথায়—নতুন দেশে গিয়ে কী আর মন টেকে এখন ? আলিজানও কান্নাকাটি করত। মনটা পোড়াত আমার। আমাদের এই দেশের নরম-নরম মাটি, গাছপালার কী সবুজ রং, মেঘ আসে আকাশ কালো করে—এসব ছাড়া আমাদের আর অন্যকিছুই ভালো লাগেনা। তাই মনে করলাম, তীর্থ করা তো হল, এবার মরব যখন তখন আমার হাড় ক'খানা বাংলা দেশের মাটিতেই যেন গোর পায়। নইলে মরার পরও শরীর জুড়োবেনা।

ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের সবুজ রেখার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ আবিষ্টভাবে বললেন, মক্কা-মদিনা দর্শন করে যত আনন্দ পেয়েছিলেন স্পষ্ট। শে ফিরে আসার আনন্দ তার চেয়ে কম নয়।

২

মাতাল জমিদারের আদর্শবাদী ছেলে সেজেছে টুটু। বাগ্দীপাড়ায় কলেরার মড়ক লেগেছে, সেখানে রাত জেগে সেবা করতে যাবার আগে বাবার সামনে এক ভাবগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই টুটু একটু বোকা-বোকা, ঐরকম বোকা-বোকা মুখ-চোখ বলে সিনেমায় আদর্শবাদীর ভূমিকা বেশ মানায়। সবুজ পাঞ্জাবি পরে টুটু অনবরত ঘামছে, মাঝে-মাঝে কাট করে মেক-আপ ম্যানেরা এসে তার মুখের মেক-আপ ঠিক করে দিচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের জমিদার বাড়ির বাগানের সেট, কিন্তু ঝোপের আড়ালে টেবল ফ্যান ফিট করা। তবুও অসম্ভব গরম।

সুটিং দেখতে আমার একেবারে ভালো লাগেনা। একঘেয়ে ব্যাপার, দু-তিনটেমাত্র কথা তুলতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, লাইটসম্যানরা আলো নিয়ে টালবাহানা করে অনবরত। কিন্তু আসতে হয়েছে মামাতো বোনেদের পাল্লায় পড়ে। মামাতো বোনেরা আগে আমাকে বিশেষ পাত্তাই দিতনা, হঠাৎ কোথা থেকে জানতে পেরে গেল, বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অমুক কুমার ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। ব্যস, সেই থেকে মিলিতা আর নন্দিতার চোখে আমিও একটা ছোটখাটো হিরো।

ওদের পীড়াপীড়িতে এবং আমি যে সত্যিই অমুক কুমারকে চিনি এটা প্রমাণ করার জন্য টুটুকে একদিন ফোন করতেই হল শুটিং দেখার জন্য। টুটু আমার মান রেখেছে, উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হয়েছে! কিন্তু অত্যন্ত বিচ্ছিরি সিনে সুটিং দেখতে এসেচি; শুধু বক্তৃতা আর বক্তৃতা। মামাতো বোনরা খুশি—একে তো টুটু অর্থাৎ অমুক কুমার রয়েছেই, তার সঙ্গে মাতাল জমিদার হিসেবে বিকাশ রায়। শুনলাম বাগ্দীর মেয়ে সেজেছে মাধবী মুখার্জি—আমার ভালো লাগত সেই সুটিং দেখলে।

সেদিনকার মতন টেক শেষ বলে, ধরাচূড়া ছেড়ে টুটু এল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর বাইরের মাঠে এসে বসলাম পা ছড়িয়ে। কিছুক্ষণ আমার মামাতো বোনদের গদগদ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে টুটু আমার দিকে ফিরে বললো, কিরে, কী করছিস আজকাল! তোর তো পাত্তাই পাওয়া যায়না!

সেদিনকার সেই বোকা টুটু, সিনেমার নায়ক হয়ে কী চালিয়াৎই হয়েছে। রংটা ফর্সা ছিল, চেহারাটা ছিল কার্তিক-কার্তিক, তাই এক পরিচালকের নজরে পড়ে যায়! শুনছি, শিগগিরই বোম্বে পাড়ি দেবে। আমি বললুম কিরে, খুব তো পিটছিস! টুটু উত্তর দিল, শুধু টাকাটাই দেখছিস, কত খাটতে হয় তা তো জানিসনা! টাকা থাকেনা—এ মাসেই তো ছোট ভাইকে একটা গাড়ি কিনে দিতে হল! ন গিয়ে

একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকে আমার মনে ঘুরঘুর করছিল। আমি টুটুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিলুম। টুটু বলল, কিরে হাসছিস কেন? আমি মামাতো বোনদের দিকে তাকিয়ে বললুম, এই তোমরা একটু ওদিকে যাও তো—বিকাশ রায় কিংবা অন্যদের অটোগ্রাফ নিয়ে এসো। আমি টুটুর সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা বলব!

তালুতে থুতনি রেখে ঘাসের ওপর কনুই ভর দিয়ে আধ-শোওয়া হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে টুটু, তোর মনীষার কথা মনে পড়ে?

এখনো মেক-আপ ওঠায়নি, কৃত্রিম উজ্জ্বল মুখ টুটুর, অবিচলিতভাবে জিজ্ঞেস করল কোন মনীষা? টাইটল কী? আজকাল নিত্যনতুন এত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সবার নাম মনে রাখা—

—বেশি চালাকি করবি তো পেছনে ক্যাৎ করে এক লাথি মারব! মনীষাকে তোর মনে নেই? সেই চন্দননগরের—

কথা শেষ হলনা। আরেকঝাঁক ছেলেমেয়ে এসে টুটুর সামনে অটোগ্রাফের খাতা খুলে ধরল। টুটু মুখে নায়কোচিত হাসি ফুটিয়ে সবার খাতাতেই সই করল। তারপর তারা চলে যেতেই প্রোডাকশান ম্যানেজারকে ডেকে গরমভাবে বলল, দ্বিজেনবাবু আপনাকে বলেছি না, স্টুডিওর মধ্যে আমি কোন অটোগ্রাফ সই করবনা! তবু এদের আসতে দেন কেন?

আমি বললুম টুটু, তুই এখনো বিয়ে করিসনি, নারে?

—না ভাই! এত মেয়ে সবসময় ছেঁকে ধরে আছে—এদের মধ্যে থেকে কাকে বিয়ে করব ভেবে পাইনা। তাছাড়া, যতদিন বিয়ে না-করছি ততদিন মেয়েমহলে ইমেজ...যাকগে, নীতীশ কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয়না পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে...তুইও তো—

—মনীষাকে তোর মনে নেই বলতে চাস?

টুটু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, কেন মনে থাকবে? যা-তা একখানা মেয়ে...গাল তোবড়ানো, পুরু ঠোঁট...ওসব মেয়ে এ-লাইনে এক্স্ট্রার পার্টও পায়না।

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে হাসতে লাগলুম। এখনো বেশ রাগ আছে দেখছি! টুটু অন্যমনস্কভাবে মাটি থেকে ঘাস টেনে-টেনে ছিঁড়তে লাগল।

টুটুর সঙ্গে অনেকদিন বাদে আজ দেখা হওয়ার পর, মনীষার কথা আমার বারবার মনে হচ্ছিল। নীতিশের বোন মনীষা, একসময় তাকে বিয়ে করার জন্য টুটু পাগল হয়ে উঠেছিল। সত্যিই দেখতে তেমন সুন্দরী ছিলনা মনীষা, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, রুচি ও ব্যক্তিত্ব ছিল স্পষ্ট। নীতিশদের বাড়িতে

সন্ধেবেলা আমরা আড্ডা মারতে যেতুম, মনীষা আর তার দিদি রুচিরাও এসে যোগ দিত আমাদের সঙ্গে। রুচিরা আবার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল, প্রায়ই সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে খুব তর্ক বাঁধত। একবার আমরা সবাই মিলে রিহার্সাল দিয়ে ওখানে একটা থিয়েটারও করেছিলাম, তাতে আমিও একটা মাঝারি ধরনের পার্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু অতিরিক্ত লাজুক বলে টুটু পেয়েছিল এক সিনের প্রতিনায়কের বন্ধুর পার্ট।

মনীষা টুটুকে নিয়ে খুব ঠাট্টা-ইয়ারকি করত, ঝকঝকে চোখা-চোখা কথা বলতে পারত মনীষা, টুটু খুব সরল আর লাজুক ছিল বলে কোনটারই ঠিক সময় উত্তর দিতে পারতনা শুধু ফর্সা চেহারায় লজ্জায় লাল হতো। দুর্বল আর অসহায়দের আঘাত করতেই তো মেয়েদের আনন্দ, টুটুকে আঘাত দেওয়ার ব্যাপারে মনীষার কোন ক্লান্তি ছিলনা। হয়তো রাজনীতি নিয়ে তর্ক হচ্ছে, টুটু যদি কখনো একটা কথাও বলত—মনীষা অমনি ধমকে উঠত, আপনি চুপ করুন। যে বিষয়ে কিছুই জানেননা—সে বিষয়ে কথা বলতে আসেন কেন ? টুটুর পোশাক আর চেহারা নিয়েও ঠাট্টা করতে ছাড়তনা, দেখা হলেই বলত, কী, মেয়েদের মতন চোখে কাজল দিয়েছেন বুঝি ? না সুর্মা ?...এঃ, আপনার গা দিয়ে কী বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে ! সেন্ট মেখেছেন বুঝি ? কিংবা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, কোনদিন কোন কাজকর্ম করেননা, শুধু দিনরাত আলস্য...। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল মনীষা—যেবার আমাদের বি.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। আমরা সবাই কোনক্রমে পাশ করে গেলুম, টুটু পারলনা—সেজন্য আমরা সবাই দুঃখিত, একমাত্র মনীষাই হেসে উঠে বলেছিল, জানতাম। আমি আগেই জানতাম।

সেই মনীষার প্রেমে পড়ে টুটু একেবারে হাবুডুবু খেয়েছিল। মনীষাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠল, আমাদের সাহায্য নিল, কাকাকেও পাঠাল মনীষাদের বাড়িতে, তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। টুটুর তখনকার পাগলামি আমাদের সকলের কাছেই ছিল পরম উপভোগ্য ব্যাপার। টুটুর সঙ্গে দেখা হলেই আমরা বলতাম, টুটু মনীষা একটু-একটু এবার রাজি হয়েছে বোধহয়, কাল তোর কথা বলছিল, তুই চারদিন যাসনি ওদের বাড়িতে...খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ! টুটু উদ্ভাসিত মুখে বলত, তাই নাকি ? সত্যি ?

কথা নেই বার্তা নেই, দুমাসের মধ্যে দুম করে মনীষা বিয়ে করে ফেলল দীপঙ্করকে। দীপঙ্করের রোগা চেহারা, ধারালো নাক, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ডিবেট করার খুব নাম ছিল। ঐ একটাই গুণ ছিল দীপঙ্করের—ধারালো কথা বলা। পৃথিবীর সবকিছু নস্যাৎ করে দিতে পারত সে যুক্তিজালে। কারুকে কিছু না-জানিয়ে ওরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে ফেলল, তারপর দীপঙ্কর মনীষাকে নিয়ে চলে

গেল বহরমপুরে এক কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে।

একদিন টুটুর ঘরে গিয়ে দেখলাম ঘরের দেওয়ালে লাল পেন্সিলে অসংখ্য দাগ কাটা। টুটু বলেছিল, আমি রোজ দেওয়ালে দাগ কাটি, একশো সতেরো দিন হয়ে গেল—মনীষাকে আমি আজও একটুও ভুলতে পারছিনা।

অন্যমনস্কভাবে ঘাস ছিঁড়ছে টুটু। সেদিন কেউ ভাবতেও পারেনি, আমাদের চন্দননগরের সেই টুটু হঠাৎ ফিল্মস্টার হয়ে যাবে—তার জন্য বাংলা দেশের হাজার—হাজার মেয়ে ব্যাকুল হবে—খোলামকুচির মতন টাকা নিয়ে খেলবে। টুটু এখন আর সেই বোকা ভালোমানুষটি নেই, এখন সে ক্যামেরাম্যান আর প্রোডাকশন ম্যানেজারদের ধমকায়, সাদা টাকা—কালো টাকার হিসেব ঠিক রাখে, প্রচারের কায়দা সম্পর্কে উপদেশ দেয়, আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিত্যনতুন রকমের হাসি প্র্যাকটিস করে। অভাবিতভাবে অনেক কিছু পেয়েছে টুটু কিন্তু মনীষার মতো একটা সামান্য মেয়ের কাছে হেরে গেছে। আজ কত মনীষাকে সামান্য ইঙ্গিত করলেই...কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই একজন তাকে অবহেলাই করেছে শুধু।

আর মনীষা? দীপঙ্কর বোধহয় চার-পাঁচশো টাকা মাইনে পায় ডিবেট কিংবা রাজনীতিও করেনা—সেই তেজি ছোকরাও সে আর নেই এখন, বোধহয় অতিরিক্ত একশো-দুশো টাকা আয়ের জন্য নোট লেখে কিংবা কোচিং ক্লাস নেয়। দুটি ছেলেমেয়ে ওদের!

টুটুকে জিজ্ঞেস করলাম, মনীষার সঙ্গে তোর আর দেখা হয়েছে?

—নাঃ, বহরমপুরের দিকে গিয়েছিলাম একমাত্র সুটিং-এ—গত বছর, একবার ভেবেছিলাম ও হয়তো আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে—অন্তত ভাইপো—ভাইঝির জন্যে অটোগ্রাফ নেবার নাম করেও, অনেকেই তাই আসে।

মনীষা তোর অটোগ্রাফ নেবে? তুই তো কুড়িখানেক চিঠি লিখেছিলি তাতেই তো তোর সই...

—এখন আমার সই বদলে ফেলেছি। তাছাড়া মনীষা কী আর সেসব চিঠি রেখে দিয়েছে নাকি?

আমি আবার হাসলাম। টুটুকে আঘাত দিতে আমার ইচ্ছে হলনা। টুটুর হয়তো কিছু যায় আসে না ও অনেককিছুই পেয়েছে এখন—তবু মনীষার কথা ওকে আমার বলতে ইচ্ছে করলনা।

মনীষার সঙ্গে মাস ছয়েক আগেই আমার দেখা হয়েছিল। কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল ওরা, আমার সঙ্গে ধর্মতলায় দেখা। চৌরঙ্গী দিয়ে দীপঙ্কর আর মনীষার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে আমি একটা সিনেমা পোস্টারে টুটুর ছবি দেখিয়ে মনীষাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী চিনতে পারো?

মনীষা ভ্রূভঙ্গি করে বলেছিল না চিনে উপায় আছে। আজকাল তো যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঐ ছবি। বাংলা হিন্দি—

—তুমি ওর বই-টই দেখেছ?

—না, একটাও দেখিনি, এবার একটা দেখে ফেলব ভাবছি। সিনেমা তো আমার দেখাই হয়না।

সিগারেটের দোকান দেখে দীপঙ্কর এগিয়ে যেতেই মনীষাকে চুপিচুপি বললুম, কী আজকাল একটু-একটু আপশোশ হয়না?

লঘুভঙ্গিতে ঝরঝর করে হেসে মনীষা বলল, একটু কেন, ভীষণ-ভীষণ আপশোশ হয়! ছবিটা দেখুন, আগে তবু একটু বোকা ভালো মানুষ চেহারা ছিল, এখন কীরকম ন্যাকার মতন দেখাচ্ছে! উঃ পুরুষ মানুষ হয়েও কেউ এত ন্যাকা সাজতে পাবে?

৩

ভ্রমণকাহিনী পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। গল্প-উপন্যাস পড়ে প্রায় নিরাশ হতে হয়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীতে সে সম্ভাবনা নেই, লেখাটা ভালো হোক বা না-হোক—কিছুক্ষণের জন্য তো সেই বর্ণিত জায়গাটায় মনে-মনে ঘুরে আসা যায়।

আমার নিজেরও ইচ্ছে করে একটা ভ্রমণকাহিনী লিখে ফেলি। কিন্তু কোন জায়গার কথা লিখব, কোন দুর্গম পাহাড়ে কিংবা অচেনা জনপদে তো যাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি এই পৃথিবীর কত রহস্য, কত মনোহারিণী শোভা আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেল। বছরের পর বছর কলকাতা শহরেই বন্দি হয়ে আছি। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লেখার খুবই সাধ আমার। তাই ঠিক করলুম, কলকাতা শহরের একখানা ভ্রমণকাহিনী নিয়েই হাতেখড়ি করা যাক।

এক নাতিশীতোষ্ণ অপরাহ্ণে, খাঁটি পরিব্রাজকের মতন সঙ্গে কিছু মালপত্র না-নিয়ে পকেটে সামান্য কিছু টাকাকড়ি, আমি কলকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে একটি নীলরঙা দোতলা বাসে উঠে বসলাম। বাসটি সেখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং বেশ ফাঁকা ছিল, দোতলার জানালার পাশে একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন পাওয়া গেল। সেইদিনই যে ভ্রমণ করার খুব একটা ইচ্ছে আমার ছিল, তা নয়, জীবনে [illegible]হৎকার্যের মতন আমার সেই অপরাহ্ণভ্রমণও আকস্মিক। আমার উদ্দেশ্য [illegible]দহ নামক অঞ্চলে নেমে কোন একটি কর্তব্য সমাপন, কিন্তু তা বদলে [illegible]গবশত। সূত্রপাত হল এইভাবে যে, বাস ছাড়ার আগেই বিড়িতে

শেষ টান দিতে-দিতে কণ্ডাক্টর মহোদয় টিকিটগুচ্ছে আঙুল চালিয়ে আমার নাকের সামনে এনে এক প্রকার উৎকট শব্দ করতে লাগলেন। আমি তখন পথের সৌন্দর্য নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। সেই শব্দে চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, কী ? তিনি বললেন টিকিট ! আমি আমার পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত পাঁচ টাকার নোটটি এগিয়ে দিলাম। কণ্ডাক্টর সেদিকে পলকের মাত্র চাহনি দিয়ে বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা ? নেমে যান !

আমি হতবাক।

আমার বরাবরই কলকাতা শহরে বাসের ভাড়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। ধরা যাক একশো মাইল দূর থেকে কেউ ট্রেনে চেপে কলকাতা শহরে আসতে চায়। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলে ভাড়া তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ'টাকা, প্রথম শ্রেণীতে প্রায় বারো টাকা দিতে হবে। একই দূরত্ব, একই ট্রেন, শুধু আসনের আরাম অনুযায়ী বিভিন্ন দাম। অথচ কলকাতায় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জগামী বাসে যারা হাতল ধরে ঝুলছে, যারা ভিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে, যারা অস্থায়ী মহিলা আসনে বসে সদা কম্পিত, যারা জানালার পাশে নিশ্চিত আরামের আশ্রয় পেয়েছে—সকলেরই টিকিটের ভাড়া এক হয় কী প্রকারে ? সুতরাং আমার মনে হল, কর্তৃপক্ষের বুঝি এতদিনে চেতনা ফিরেছে। দোতলায় জানালার ধারের আসনকে এয়ারকণ্ডিশনড কামরার মর্যাদা দিয়ে ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কত ভাড়া ? কণ্ডাক্টরটি পুনশ্চ বিরক্তিভরে বললেন, বললুম তো খুচরো নেই। নেমে যান ! নেমে যান !

শাস্ত্রে আছে, যেসব মানুষের শরীর অত্যধিক রোমশ হয়, যাদের বর্ষাকালে জন্ম, যাদের শরীর রোগা নয় আবার খুব স্থূলও নয়, যাদের চোখ বড় কিন্তু নাক ছোট, যারা দ্রুত স্নান সারে কিন্তু খাবার খেতে দেরি করে, যারা দিনে ঘুমোয় কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে, সেইসব মানুষ অত্যন্ত গোঁয়ার প্রকৃতির হয়। আমার সঙ্গে এর প্রত্যেকটার মিল থাকা সত্ত্বেও—আমি গোঁয়ার গোবিন্দ হিসেবে তেমন পরিচিত নই। কিন্তু এক নিরুপদ্রব বিকেলবেলা নিশ্চিন্তভাবে বাসের জানালায় বসেছি, এমন সময় আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না-বলেই 'নেমে যান' বলায় চড়াৎ করে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠল। একবার বললেও হয়তো অতটা মনে করতামনা, কিন্তু পরপর দুবার নেমে যান নেমে যান আমার কানে অতিশয় রুক্ষ শোনাল। তখন আমি স্থিরভাবে বললুম আমি নেমে যাবনা, আমি এখানেই বসে থাকব। এই বাস যতদূর যায় ততদূর যাব তার মধ্যেও যদি আপনার খুচরো না হয়—তবে এই বাস যতবার আজ যাতায়াত করবে—আমি এখানেই বসে থাকব—যদি তাতে পাঁচ টাকার পুরো ভাড়া হয় !

অতএব এরপর আমার যাত্রার আর কোন উদ্দেশ্য রইলনা, আমি ভ্রমণকারীর মতন নিরাসক্তভাবে বসে রইলাম। অন্যদিন কাজের জন্য বাসে চাপতে হয়, তখন তাড়া থাকে কতক্ষণে পৌঁছুব। আজ সেরকম কিছু নেই বলেই—অনেককিছু চোখে পড়তে লাগল।

পাইকপাড়ার রাজা-রানীদের স্মৃতিমণ্ডিত রাস্তা ধরে বাস ছুটছিল, অচিরে তা দুবার ডানদিকে বেঁকে বেলগাছিয়ায় এসে পৌঁছুল। বেলগাছিয়ার রাস্তাটুকু অতিশয় অভিনব। এখানে বাস কিছুক্ষণ ঘোড়ার চাল অনুসরণ করে। প্রতি কদমে বাসটি লাফিয়ে উঠছে ও ডানদিকে-বাঁদিকে হেলছে—সেই অনুযায়ী যাত্রীরাও। একেবারে সামনের আসনে কয়েকটি শিশু ছিল তারা আনন্দে খলখল করতে লাগল। আমার মনে পড়ল, অতিশৈশবে দার্জিলিং গিয়ে বাবার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে আমারও এইপ্রকার আনন্দ হয়েছিল। যেসব বাচ্চারা আজকাল দার্জিলিং যেতে পায়না—তাদের আনন্দের জন্যই বোধহয় বেলগাছিয়ার রাস্তায় এই বন্দোবস্ত। তারপরেই বাসের নৃত্য থামল, জলের সরসর শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি ব্রিজের পাদদেশ সম্পূর্ণ জলমগ্ন। গত পূজার পর আর একদিনও বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়েনা—কিন্তু বেলগাছিয়া ব্রিজের কাছে কোমর জল, বাস তার মধ্যে সাঁতার কাটিতে লাগল। কলকাতার বাসগুলি সত্যিই বাঘের বাচ্চা—জল-স্থলের কোন বাধাই তারা মানেনা, মনে হয় শূন্যপথেও তারা যাতায়াতে পারঙ্গম। এক মহিলা সেই কোমর জলে রিকশা চেপে আসছিলেন, রিকশা থেকেই তিনি বাসের পাদানিতে লাফ দিয়ে পড়লেন।

বাস ব্রিজের ওপর উঠল, এবার দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ব্রিজটি বেশ উঁচু, দূরে অনেক নিচে শ্যামবাজারের গমগম জনতা। ব্রিজের দুপাশে বহু আঁকিবুকি কাটা রেললাইন—দিগন্তবিস্তৃত শূন্যতা—মেদুর সন্ধ্যা তার ওপর ঝুঁকে আসছে। ডানধারে পার্শ্বনাথের ঠাণ্ডা ছিমছাম মন্দির, ভিতরে জলাশয়, তার আশেপাশে সুবেশ নরনারী। বাঁদিকে একটি শিবমন্দিরের শুধু চূড়াটুকু উঠে আছে, তার ওপর প্রাইভেট বাসের কণ্ডাকটররা কী কারণে যেন পয়সা ছুঁড়ে দেয়। বাস এখানে একবার শরীর ঝাড়া দিল, যেন শহরতলি ছেড়ে শহরে ঢুকবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে। শ্যামবাজারে এসে থামা মাত্র একটা বিশাল ভিড় বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সার্কুলার রোডের একটি বিশেষত্ব আছে—এতদিন চোখে পড়েনি। সার্কুলার রোডের বাঁপাশে প্রায়শই বস্তি, কিন্তু ডানপাশে সবই প্রায় পাকাবাড়ি। সার্কুলার রোডের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এত বস্তি কেন, বস্তির বদলে ব্যারাকবাড়ি তুলে দিলে অনেক স্থান সঙ্কুলান হত—এসব কথা

তুলছিনা। একটা রাস্তার একদিকে বেশি বস্তি, অন্যদিকে বেশি পাকা-বাড়ি—এর কারণ কী ? তখন মনে হল, হয়তো কলকাতার প্রাচীন কালের চিহ্ন এখানে এখনও রয়ে গেছে। সার্কুলার রোড তো খাল-ভরাট-রাস্তা। বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যে খাল কাটা হয়েছিল—সেটাকেই পরে বুঁজিয়ে রাস্তা হয়েছে। অর্থাৎ এই রাস্তাটির ডানদিকে ছিল কলকাতা শহর বাঁদিকে গ্রাম—বাঁদিকের বস্তিগুলোয় এখনো বোধহয় সেই গ্রামের চিহ্ন রয়ে গেছে।

শিয়ালদহে এসেও আমার মন কেমন করলনা। বিবাগী ভ্রমণে বেরিয়েছি—আজ আর কর্তব্য-কর্ম থাক। ইতিমধ্যে পুরানো যাত্রীরা অধিকাংশ নেমে গিয়ে নতুন যাত্রীদল উঠেছে : এক-এক এলাকার যাত্রীদের পোশাকেও কিছু-কিছু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে—কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। মৌলালি থেকে বাঁদিকে ঘুরতেই দৃশ্য আমূল বদলে গেল। এ এক নতুন কলকাতা। ঝকঝকে পরিষ্কার দুপাশের বাড়িগুলি নতুন, জানালার পরদায় হরেক শোভা। বারান্দায় রেলিং ধরে ঝোঁকা মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী পুরুষদের পা-য় হরিণের চামড়ার চপ্পল। পথও দুভাগ করা, মাঝখানে সবুজ ঘাসের নর-চারণ ক্ষেত্রং। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরন, তখন তাঁর গুরু অ্যারিস্টটল নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীর যত জায়গাতেই যাও, মানুষের মতন এত আশ্চর্য জিনিশ আর কিছুই দেখবেনা। সুতরাং বাসের জানালায় বসে আমি যে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই দেখছিলাম, তা নয়, দোতলার প্রত্যেক যাত্রীর ওঠা-নামা এবং ধরন-ধারণও লক্ষ করছিলাম। তাছাড়া আজকালকার ভ্রমণকাহিনীতে একটি সুন্দরী নায়িকা এবং দুটো-একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা না-থাকলে জমেনা। আমার এ ভ্রমণকাহিনীতেও তার অভাব নেই, যথাসময়ে বলছি।

বাস তখন ভিড়ে ভর্তি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের দুটি আসনই ভর্তি, তাছাড়াও দু-একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি বসেছি অনেক দূরে, সেখান থেকে হঠাৎ শিভালরি দেখাবার অবকাশ নেই। আমার পাশে আগাগোড়া বসে আছে একজন হিন্দুস্থানী, তার প্রতি আমার রাগের উদ্রেক হবার কোনই কারণ নেই, কিন্তু তার কাঁধে একখানি ময়লা গামছা। আমার বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, এই ভর সন্ধ্যাবেলা তুমি কী বাসে চেপে কোথাও স্নান করতে যাচ্ছ ? তা যদি না হয় তবে ঐ মহামূল্য গামছাখানা বাড়িতে রেখে এলে কী তুলসী দাসের রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যেত ? আমার সামনের সীটের দুজন প্রৌঢ় অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায়, পঞ্চাশ হাজার কিংবা ষাট হাজার টাকার কী একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন ! পিছনের সীটে দুজন যুবক ভারতের ক্রিকেটভাগ্য নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত। একেবারে সামনের সীটে-বসা এক ভদ্রলোক একেবারে

পিছনের সীটে-বসা একজন চেনা লোককে দেখে চিৎকার করে সারা বাস শুনিয়ে ঘোঁতনদার বিয়ের দিন কী কাণ্ড হল সেই গল্প শুরু করলেন। বাস সি আই টি রোড ছেড়ে বাঁদিকে বেঁকল।

বণ্ডেল রোড, চার নম্বর গেট এইসব নামগুলো কেমন যেন অচেনা। এতকাল কলকাতা শহরে আছি, অথচ চার নম্বর গেটের পাশে থাকি—একথা কারুকে বলতে শুনিনি। অথচ, কণ্ডাক্টর চার নম্বর গেট, চার নম্বর গেট বলে চেঁচাচ্ছে—অমনি একদল লোক হুড়মুড় নেমে যাচ্ছে, একদল লোক উঠছে। এখানেও তো কম লোক থাকেনা। আমার ইচ্ছে হল, একদিন পায়ে হেঁটে এ রাস্তা দিয়ে ঘুরব। এখানে রাস্তাটা খুব ছোট, দুটো বাস পাশাপাশি এলে সরু হয়ে কাৎ হয়ে যেতে হয়। উগ্র কাচা চামড়ার গন্ধ। পাশে রেললাইন। ছোট-ছোট খাপরার ঘরে গরু-ছাগল আর মানুষ একসঙ্গে রয়েছে। রাস্তায় কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে। বড় শহরের এইরকমই বৈশিষ্ট্য 'বড়'র পিরীতি বালির বাঁধ ক্ষণেক হাতে দড়ি খনেক চাঁদ'। এইমাত্র ছিল সি আই টি রোডের চমৎকার রাস্তা, সাজানো বাড়ি-ঘর—মাঝখানে চামড়ার হঠাৎ গন্ধ আর বস্তি আর আবর্জনা—আমার একটুপরেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মর্ত্যের স্বর্গ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে বাস হাজরা রোডে পড়ল।

এখানে হঠাৎ বাস প্রায় খালি। মনে হয় বাসে চড়ার মানুষ এসব রাস্তায় খুব কম থাকে। এখন দোতলা বাসেব জানালার ধাবে-ধারে একজন-একজন বসে আছে। পাশের সীটগুলো প্রায় ফাঁকা। আমার পাশের লোকটিও কখন যেন নেমে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ উগ্র সেন্টের গন্ধ নাকে লাগল।

'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন'?

চমকে উঠলাম। কণ্ডাকটর নয়, এক তরুণী, হালকা নীল-রঙা নাইলন জর্জেট পরা, কানে দুটি মুক্তোর দুল। মেয়েটিকে সুন্দরীই বলতে পারতাম, কিন্তু ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধ সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল। মেয়েটির পিছনে বাচ্চাছেলে কোলে নিয়ে একটি পুরুষ, পুরুষটিকে দেখলেই বোঝা যায়—কোন এক গোধূলি লগ্নে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। ব্যাপারটা বোঝা গেল, বাসের প্রায় সবকটা আসনই একটা-একটা খালি, ওঁরা পাশাপাশি বসতে চান। মেয়েটি ব্যগ্র গলায় আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন'?

আমি মেয়েদের অন্ধ স্তাবক। কিন্তু এটুকু জানি মেয়েদের আর যত গুণই থাক—সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ মেয়েরই ভদ্রতাবোধ তেমন প্রবল নয়। ট্রামে-বাসে হিলতোলা জুতোয় পুরুষদের পা মাড়িয়ে দিয়ে মেয়েরা অক্লেশে ভ্রূক্ষেপহীন থাকে, লেডিস সীটে বসে থাকা পুরুষদের তুলে দিয়ে তাদের প্রতি একটু সামান্য

কৃতজ্ঞতার হাসি বিলোতেও তারা কার্পণ্য করে। এমনকী এইধরনের স্বার্থপর অনুরোধও তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। এইজন্যই পুরুষটি সলজ্জ মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যাইহোক, মেয়েদের দেখে তড়াক করে আসন ছেড়ে দিতে আমার বেশ ভালোই লাগে, তাতে মনের মধ্যে একধরনের সুড়সুড়ি বোধ করি। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধের জন্য মেয়েটিকে আমি গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছিলাম। আমি বিলাতপ্রেমিক নই, কিন্তু দিশি সেন্টের গন্ধের চেয়ে ঘামের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, কাচা চামড়ার গন্ধ, পেট্রোল পোড়ার গন্ধ এসব স্বাভাবিক গন্ধও আমার অনেক ভালো লাগে। কিন্তু মেয়েটির অনুরোধ তো প্রত্যাখ্যান করা যায়না। সেইজন্য শীতকালের পুকুরে স্নান করতে মামার সময় যেরকম আলস্য লাগে—সেইরকম ভঙ্গিতে আমি চটিতে পা গলাতে-গলাতে বললুম, উঠতে হবে? আচ্ছা—

মেয়েটি বোধহয় আমার ভঙ্গি দেখে অপমানিত বোধ করল। আমার কথার উত্তর না-দিয়ে মেয়েটি সামনের সীটের আরেকজন পুরুষের পাশে বসে পড়ে স্বামীকে বলল, তুমি ওখানেই বসো—একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়না...পুরুষটি লাজুক মুখে আমার পাশে বসলেন। আমি হাসি চেপে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, ঐ তো ট্যাক্সি যাচ্ছে, ডাকোনা, ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

রাস্তা দিয়ে আলো জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, পুরুষ ও নারীটি বাসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সমস্বরে চেঁচাতে লাগল সেটার উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সিটা হঠাৎ থেমে পড়ল এবং দোতলা বাস তার পিছনে একটা ঢু মারল। সঙ্গে-সঙ্গে কেঁপে উঠল জগৎসংসার, ঝন ঝন ঝন আমার কপাল ঠুকে গেল সামনের সীটে, মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। বাসসুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাকসিডেন্ট! অ্যাকসিডেন্ট!

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার ভিড়, দুপদাপ করে আমরা সবাই বাস থেকে নেমে পড়লাম। সেই মেয়েটির হাত ধরে পুরুষটি পিছনদিকে দ্রুত পালাল। আমার ভ্রমণপর্বেরও সেইখানেই শেষ।

ভ্রমণের অশেষ উপকারিতা। সেদিন আমি ভ্রমণ করব এই মনস্থ করাতেই শেষপর্যন্ত আমার বাসের ভাড়া লাগেনি।

৪

মানুষের দুঃখের কি কোন মাত্রা আছে ? কেউ বেশি দুঃখী, কেউ কম দুঃখী একথা কী ক'রে বোঝা যায় ?

আমার বন্ধু, পরমেশকে বেশ ফিটফাট সুখী লোক বলা যায়। এ পর্যন্ত কেউ তাকে পালিশহীন জুতো পরতে দেখেনি, ভোরবেলা সূর্য ওঠবার আগেই প্রত্যেকদিন সে দাড়ি কামিয়ে ফেলে—এমনই তার সদা ছকচকে মুখ। দীর্ঘ উন্নত চেহারা, সরল স্বাস্থ্য, গায়ের রং ফর্শা, সে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তরুণী মেয়েরা পরমেশকে ফিলম স্টার মনে করে ফিরে দেখে। বস্তুত একটা ফিলম নায়কের পার্ট করার জন্য পরমেশের কাছে প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু বেশি লোকজনের সামনে পরমেশ বিষম লাজুক হয়ে পড়ে, গলার আওয়াজটাও একটু ভাঙা-ভাঙা —তাই পরমেশ রাজি হয়নি। ফিলমস্টার হবার বিশেষ ইচ্ছেও ওর কখনো ছিলনা —সেজন্য পরমেশ ও ব্যাপারে দুঃখ পায়নি।

পরমেশ তার প্রভাবশালী ছোট মামার সুপারিশে ভালোই চাকরি পেয়েছে, আশির্বাদপূতঃ ভাগ্যবান কয়েকজন, অর্থাৎ 'চোজেন ফিউ'-এর অন্যতম পরমেশ রোজ সুট-টাই পরে স্কুটারে চেপে অফিস যায়। পাক্কা সাহেবদের মতন দুপুরে লাঞ্চ খায়, পার্কস্ট্রিটের দোকানে। এক বিখ্যাত ডাক্তারের মেয়ে চম্পা সান্যালের সঙ্গে পরমেশের প্রেমও গভীর হতে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে পম্পাকে নিয়ে বেড়াতে যায় ফুরফুরে হাওয়ায়। ওদের বিয়ে হলে দু'বাড়িতেই কোনরকম আপত্তি করার কথা নয়। সচ্ছল-সুখী-তৃপ্ত জীবন মনে হয় পরমেশের।

কিন্তু আমি জানি, পরমেশ বড়ই দুঃখী। ওর দুঃখের কারণ, আজও স্কুটার ছেড়ে পরমেশ গাড়ি কিনতে পারলনা। ওর অফিসের সমান চাকরেদের আর সবারই গাড়ি আছে, পরমেশের শুধু নেই—এতে ও মনে-মনে গভীর অপমান বোধ করে। চম্পাকে নিয়ে বেড়াতে যায় যখন, তখন স্কুটারটা বাড়িতে রেখে যেতে হয়। কেননা, চম্পা যদিও স্কুটারে চাপতে খুবই ভলোবাসে, কিন্তু সবার চোখের সামনে দিয়ে স্কুটারে চেপে সে প্রেম করতে যাবে—এতখানি উদার তার অভিভাবকরা নয়। এখনো তাকে বান্ধবীর বাড়ি কিংবা মিস্টুনি বউদির বাড়ি যাচ্ছি বলে পরমেশের সঙ্গে দেখা করতে হয়। পরমেশের ঐ দুঃখ নিজের স্কুটার থাকতেও তাকে ট্যাক্সি চেপে প্রেম করতে হচ্ছে। যদি গাড়ি থাকত ! কবে গাড়ির জন্য নাম লিখিয়ে রেখেছে, এখনো কোন সাড়াশব্দ নেই।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, নতুন গাড়ির জন্য পরমেশের নাম লেখানোর ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি নয়। নতুন গাড়ির বদলে একটা ভালো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি

ও তো অনায়াসেই কিনতে পারত। পরমেশ অবশ্য পুরোনো জিনিশ পছন্দ করেনা, তার নিজের প্রতিটি জিনিশ ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন, অপরের ব্যবহার করা তোয়ালে দিয়ে জন্মেও হাত মুছবেনা, সেইজন্যই কী অপরের ব্যবহার করা গাড়িতে তার অরুচি? কিংবা, পরমেশ যা-ই বলুক, গাড়ি কেনার সামর্থ পরমেশের বোধহয় এখনো হয়নি।

পরমেশের দুঃখ আসলে দুরকম। ও স্কুটার চালাতে সত্যিই ভালোবাসে। দক্ষ হাত, কালো চশমা পরে রূপবান পরমেশ যখন উইণ্ড শিল্ড ছাড়াই চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল গতিতে স্কুটার চালায়, তখন ওকে অপূর্ব দেখায়। যেন আগেকার অশ্বারোহী বীরপুরুষদেরই নতুন রূপ। সেই তুলনায় মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এর সামনে তার রূপ অনেকটা ম্লান। কিন্তু তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার পূর্ণতার জন্য তার মোটরগাড়ি চাই। মোটরগাড়ি ছাড়া তার প্রেমও বাধা পাচ্ছে। মোটরগাড়ি কিনলে প্রিয় স্কুটারটা তাকে ছাড়তে হবে—এই ভেবে তার দুঃখ, আবার মোটরগাড়ি এখনও কেনা হচ্ছেনা—এইজন্যও তার দুঃখ। দুই দুঃখের দোটানায় পরমেশ গভীরভাবে দুঃখী।

থিয়েটার রোডের মোড়ে পরমেশের সঙ্গে দেখা। ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে পরমেশ স্কুটার থামিয়েছে। আমি ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কী রে পরমেশ, কেমন আছিস?

পরমেশ চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আরে তুই! আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিস যে। দেখাই পাওয়া যায়না।

আমি বললুম, আয় এপাশে চলে আয় না, কোন্ চায়ের দোকানে একটু বসা যাক।

—আরে আজ নয়, আজ আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ছ'টার সময়! আর-একদিন...

ছটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো এখন কী? কার সঙ্গে? চম্পা? চম্পা এখনো তোকে পাত্তা দিচ্ছে?

—আমাকে পাত্তা দেবেনা কী তোকে দেবে?

—এখনতো পাঁচটা বাজে, ছ'টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট—অনেক দেরি, আয় একটু আড্ডা দিই।

—নারে, বাড়িতে স্কুটারটা রেখে আসতে হবে আগে—

—তুই এখনো গাড়ি পেলিনা? আমি তো ভেবেছিলাম এতদিন তুই গাড়ি কেনা আর বিয়ে দুটোই সেরে ফেলেছিস।

—হঠাৎ পরমেশের হাসিখুশি মুখখানা বদলে গেল। গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলল, ধুৎ কোন জিনিশ কী আজকাল ইচ্ছেমতন হয়। একটা গাড়ির জন্য কত

লোককে ধরাধরি করলুম, ধ্যাত্তেরি স্কুটার নিয়ে দিনরাত ট্যাং ট্যাং করতে-করতে জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল।

—কী রে, তুই তো স্কুটার চালাতে খুব ভালোবাসতিস আগে ! বিনা কাজেও ঘুরতিস স্কুটারে চেপে।

মা যে-চোখে তার মৃত সন্তানের ছবি দেখেন, সেইরকমভাবে পরমেশ তার স্কুটারের দিকে এক পলক তাকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর ভালোবাসা !

সবুজ বাতি জ্বলতেই পরমেশ মাটি থেকে প্যাডেলে পা তুলে বলল, চলি রে আজ, আসিস একদিন বাড়িতে...। স্পীড নিয়ে পরমেশ রাস্তা পেরিয়ে রেড রোডের দিকে ছুটে গেল, আর-একবার ফিরে তাকালো আমার দিকে। কী-রকম দুঃখী আর একা মানুষের মুখ !

পরমেশের এই দুঃখকে মনে হতে পারে বিলাসিতা। কত লোক ট্রাম-বাসেই হাতল ধরার সুযোগ পায়না, ওর তো স্কুটার আছে কিংবা কত লোক খেতে পাচ্ছেনা—সেই তুলনায় ওর আবার দুঃখ কী ! এইখানেই আমার সন্দেহ, কারুর দুঃখই বোধহয় সামান্য কিংবা বেশি নয়। ফুটপাতে শুয়ে থাকা ভিখারি বুড়ি গভীর রাত্রে জেগে উঠল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে, গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে বসল, সেখানেও বৃষ্টির ছাঁট, রাস্তায় জল জমে ক্রমশ ফুটপাত গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। বুড়ির তখন আর কোথাও যাবার উপায় থাকবেনা। পোঁটলাপুঁটলি বুকের কাছে জড়িয়ে বুড়ি জুলজুলে চোখে অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখছে জলের এগিয়ে আসা। সেই গভীর রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে বুড়ির দুঃখ ও একাকিত্বও আমি দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে পরমেশের কোন তুলনা আমার মনে আসেনি। একথা কখনো মনে হয়নি, পরমেশের চেয়ে ঐ বুড়ির দুঃখ বেশি। পরমেশের দুঃখের জন্য আমার কোন সমবেদনা হয়না অবশ্য বরং একটু হাসিই পায়। কিন্তু বুড়ির দুঃখের জন্যই কি আমার সমবেদনা আছে ? সমবেদনা কথাটার মানে কী ? ঐ বুড়ির দুঃখ দূর করার জন্য আমি কোনদিন কিছুই করবনা। ওকে বৃষ্টির মধ্যরাত থেকে তুলে এনে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারবনা, যেমন পরমেশের গাড়ি জোগাড় করে দেবার জন্য আমি নিজে নিশ্চয়ই কখনো ছোটাছুটি করবনা। তাহলে আর ওদের দুজনের মধ্যে তফাৎ কী ! পরমেশ যদি ওর স্কুটারবাহন অবস্থাটা মেনে নেয়, তাহলে আর ওর কোন দুঃখ থাকেনা, তেমনি ঐ বুড়িও তো ওর মধ্যরাত্রে বৃষ্টিভেজা অবস্থাটা মেনে নিতে পারে !

কে যেন আমার মনের মধ্য থেকে বলছে, মূর্খ, স্কুটারের বদলে মোটরগাড়ি না-পেলে কিংবা চম্পার বদলে মল্লিকার সঙ্গে প্রেম করলে পরমেশ মরবেনা, কিন্তু খেতে না-পেলে সামান্য আশ্রয় না-পেলে মানুষ মরে যায়। ঠিক ! খেতে না-পেলে

বেশ কষ্ট হয়—আমি নিজেও মাঝে-সাঝে তা টের পেয়েছি—এমনকী শেষ পর্যন্ত মরেও যায় অনেকে—সে অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার এখনো হয়নি—কিন্তু খেতে না-পাওয়াটা কী দুঃখের ?

আমাদের বাড়িতে তিনটে বাচ্চা ভিখিরি মেয়ে প্রায় রোজই আসে। সাত থেকে এগারোর মধ্যে বয়েস, শুধু ইজের-পরা খালি গা, মাথার চুল ধুলোময়লায় জটলা পাকানো। এসেই ওরা আমাদের বাড়ির সিঁড়িতে বসে পড়ে চেঁচিয়ে বলে মা দুটি ভিক্ষা দেবে—শেষকথা সুর করে দে-বে-এ-এ-এ বলে টেনে চলে। রিনরিনে মিষ্টি গলা ওদের, তিনজন যখন একসঙ্গে চেঁচায়—মনে হয় যেন একসঙ্গে রিহার্সাল দিয়ে ওরা একটা গান গাইছে। বেশিরভাগ দিনই বাড়ির লোক ওদের দিকে নজর দেয়না, ওরা সিঁড়িতে বসেই থাকে, হাতে খুচরো পয়সা নিয়ে লোফালুফি করে, নিজেদের মধ্যে খুনসুটিতে মেতে থাকে, ভিক্ষে নেবার খুব একটা গরজ নেই যেন। একদিন দেখি, ওরা সিঁড়ির নিচের চাতালে নয়াপয়সা দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছে। আমি তাড়া দিয়ে বললুম এই পাগলি। কী হচ্ছে এখানে ! যা, পালা ! ওরা খিলখিল করে হাসতে-হাসতে ছুটে পালিয়ে যাবার সময় একজন আমার উদ্দেশ্যে বলে গেল, আমি পাগলি না, তুমি পাগলা ? যে বলল কী সুন্দর, সেই মেয়েটার মুখের গড়ন অবিকল নার্গিসের মতন। আমিও হেসে ফেললাম। ঐ বাচ্চাগুলো খুব তো দুঃখে আছে বলে মনে হলনা। বেশ খেলায় মেতে আছে, ভিক্ষে করাটা যেন একটা খেলা, খিদের কষ্টও যেন খেলার অঙ্গ, যদি খেতে না-পেয়ে একদিন মরতে হয়—তবে ঐরকম এক্কা-দোক্কা খেলার মতোই মৃত্যু-মৃত্যু খেলা খেলতে-খেলতে মরে যাবে মনে হয়, কিন্তু ওরা মরবেনা। ক্ষুধার্ত মানুষেরা একদম মরতে চায়না, তারা বিষম বেশি বাঁচতে চায়। ওরা বেশি বাঁচতে চায় বলেই পৃথিবীতে ক্ষুধার্তের সংখ্যা এত বেশি ! বাচতে চায় বলেই, খেতে না-পেলেও দুঃখ কম। অথচ, পরমেশ সামান্য মোটরগাড়ি কিনতে পারছে না বলেই বলেছিল, দূর দূর, জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল ! বাসের জানালার ধারে বসে আমি যাচ্ছিলাম একদিন, একজন বুড়ো ভিখিরি এসে হাত বাড়াল। শরীরের প্রত্যেকটা হাড় গোনা যায়, চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে, হাতখানা যেন কঙ্কালের হাত। আমি তাকে দশটা নয়াপয়সা দিয়ে খুব মিষ্টিভাবে বললুম, আর বেঁচে থেকে কী হবে তোমার ? এবার মরলেই তো হয় ! সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ জ্বলে উঠল, চেঁচিয়ে বলল, আমি মরব কেন, তুই মর না, মর, মর, আজই তোর কলেরা হোক... ! এমনভাবে যে বাঁচতে চায় একে আমি কিছুতেই দুঃখী বলতে পারিনা।

অথচ আমার এক বন্ধুর মাসিমা, আমিও তাঁকে টুকুন-মাসিমা বলতুম, তিনি আত্মহত্যা করলেন। তার তো কোন অভাব ছিলনা। নিউ আলিপুরে বাড়ি, দুটি

অপ্সরা-গন্ধর্বের মতন ছেলেমেয়ে, দু'খানা গাড়ি, একবার বিলেত ঘুরে এসেছেন। ডাকসাইটে সুন্দরী তিনি, রেডিওতে অতুল প্রসাদের গান শোনান, পার্টিতে মজলিশে প্রথম আকর্ষণীয়া, আমাদের থিয়েটার রিহার্সালে কীরকম হৈ-হুল্লোড়-মজা করতেন, মিউজিক কণ্ডাক্ট করেছিলেন টুকুনমাসি। সেই টুকুনমাসি আচম্বিতে একদিন আত্মহত্যা করলেন। কোনকিছুরই অভাব ছিল না তাঁর, শুধু নাকি ভালোবাসার, তাঁর স্বামী প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ অফিসের স্টেনোর সঙ্গে...। কিন্তু তাতে কী ক্ষতি হয়েছিল সবরকমের সাচ্ছন্দ্য সুখভোগ, আরাম তো তার ছিলই, শুধু ভালোবাসা না-পাওয়াটা আর কী এমন ? এখানে যদি সেই কথাটা আবার ওঠে কত লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না—সেই তুলনায় ভালোবাসাটা, যা না-হওয়াটা আবার দুঃখ নাকি ? ওটা স্রেফ ন্যাকামি ! স্বামীর ভালোবাসা পাননি তো কী হয়েছে, আরো কত লোকের ভালোবাসা তো পড়ে আছে, অমন দুঃখ ক'জন পায় শুধুশুধু...। কিন্তু এ তুলনাটা আমি মানতে পারিনা। খেতে না-পাওয়ার চেয়েও ভালোবাসা না-পাওয়ার দুঃখ নিশ্চয়ই টুকুনমাসির কাছে কম তীব্র নয়, নইলে নিজের সারা শরীরে পেট্রোল ঢেলে অগ্নি জ্বালিয়ে অমন বীভৎসভাবে কেউ মরে ?

সুখী মানুষদের বোধহয় দুঃখবোধ বেশি। সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের একটা অতিরিক্ত লাভ এই যে তখন বেশ দুঃখ নিয়ে নেশা করা যায়। বৃষ্টির মধ্যরাতে ফুটপাতে বসে-থাকা সেই বুড়ির আদৌ কোন দুঃখবোধ আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়, কেননা সে বেঁচে থাকার কাজে ব্যস্ত। আর বেঁচে থাকা যাদের কাছে খুব সহজ, তাদেরই নানারকম দুঃখবোধ, এমনকী আশ্চর্য, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এই দুঃখ নিয়ে যেতেও চায় !

৫

আমি অত্যন্ত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম একি অতুলদা ? একি চেহারা হয়েছে আপনার ?

অতুলদা বিমর্ষভাবে হাসলেন শুধু। আমি ফের প্রশ্ন করলুম আপনার কোন কঠিন অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি।

—নারে; আমার কিছু হয়নি। বল্লবীর অসুখটাই—

অতুলদার সমস্ত চুল পেকে গেছে রাতারাতি, চোখদুটো কোটরগত, মুখে একজন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, পরাভূত মানুষের ছবি।

অবাক না-হয়ে উপায় নেই। মাসছয়েক আগেও অতুলদাকে দেখেছি, কী সুন্দর দীপ্ত ও তেজস্বী চেহারা। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন সাবলীল, চকচকে কালো ঢেউ খেলানো মাথার চুল। আগে মার্চেন্ট নেভিতে যখন কাজ করতেন, তাঁর ধপধপে সাদা পোশাক ও নীল বর্ডার দেওয়া টুপি পরিহিত মূর্তি এখনও চোখের সামনে ভাসে। বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বেশি বয়েস নয় অতুলদার হঠাৎ এই কয়েকমাসে তাঁর এই বিস্ময়কর রূপান্তর —কল্পনাই করা যায়না।

অতুলদা ছিলেন আমাদের ছেলেবেলার হীরো। খেলাধুলো, পড়াশুনো—সবদিকেই চৌকোশ, হো-হো করে হাসতেন, রেডিওতে যে-কোন গান শুনলেই গলা মিলিয়ে গাইবার চেষ্টা করতেন, সবসময় প্রাণবন্ত। সমস্ত ছেলেমেয়ের সঙ্গেই ছিল তাঁর আন্তরিক ব্যবহার—তবু কোন ফাঁকে তিনি শান্তাদির সঙ্গে প্রেম করে ফেললেন—আমরা বুঝতেই পারিনি, শান্তাদিব সঙ্গে যখন ওঁর বিয়ে হল—সবাই একবাক্যে বলেছিল, এমন আদর্শ দম্পতি সচরাচর দেখা যায়না। মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে অতুলদা একটা ইটালিয়ান জাহাজ কম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন, বছরে তিন-চারমাস মাঝসমুদ্রে কিংবা দূর-দূরদেশের বন্দরে কাটিয়ে আসতেন। ফিরে আসার পর অতুলদার শরীরে আমরা কল্পনায় বিদেশের সৌরভ পেতাম।

শুধু রোমান্টিক দিকটাই নয়। অতুলদার ন্যায়-অন্যায় ও আদর্শবোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। যেটাকে তিনি অন্যায় কিংবা যুক্তিহীন মনে করতেন, সেটা তিনি অন্য কারুর কথায় কিংবা অনুরোধেও মেনে নিতেন না। আদর্শজ্ঞান তো অনেকেরই থাকে—কিন্তু জীবনে ক'জন আর তা মেনে চলতে পারে? অনেকসময়েই গুরুজন, আত্মীয়স্বজনের যুক্তিহীন অনুরোধে অনেককিছুই ঢোক গিলে সহ্য করে যেতে হয়। অতুলদাকে ঐজন্য আমরা আরও বেশি শ্রদ্ধা করতাম।

অতুলদা প্রথম চমকপ্রদ কাজ করেছিলেন তাঁর বাবার মৃত্যুর পর। ওঁর বাবার যখন হঠাৎ স্ট্রোক হল, অতুলদা পাগলের মতন ছোটাছুটি করেছিলেন, কলকাতার সবচেয়ে বড় স্পেশালিস্টকে জোর করে ধরে এনেছিলেন মাঝরাত্রে, শেষরাত্রে ধর্মতলা থেকে ওষুধ এনেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুর পর, অতুলদা আড়ালে কেঁদেছিলেন কি না আমরা দেখিনি, কিন্তু অতুলদা অশৌচ পালনে অস্বীকার করলেন, মাথা ন্যাড়া হলেননা, এমনকী শ্রাদ্ধ করতেও রাজি হলেননা। তাঁর আত্মীয়স্বজন, শ্বশুর-শাশুড়ি এসে অনুনয়-বিনয়, ভর্ৎসনা, তিরস্কার কতকিছু করলেন কিন্তু অতুলদা অটল। তিনি বলেছিলেন, আমার বাব্যকে আমি বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছি, তা যখন পারিনি—তখন এসব অবান্তর জিনিশ

নিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। আমি এসব বিশ্বাস করিনা, আমি পরলোক মানিনা, শুধু-শুধু কতকগুলো সামাজিক সংস্কার আর ভড়ং-এর জন্য আমি টাকা খরচ করতেও রাজি নই, কষ্ট সহ্য করতেও রাজি নই। আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, তাঁকে খুশি করার জন্য না হয় আমি এসব করতাম কিন্তু তিনিও বেঁচে নেই—শুধু-শুধু কতকগুলো বামুনকে আমি ডেকে এনে খাওয়াবই-বা কেন, আর ন্যাড়ামাথায় অফিসে যাবই-বা কেন?

পরলোকে অনেকেই বিশ্বাস করেনা, অনেকেই আজকাল ঠাকুর-দেবতা মানেনা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ সত্ত্বেও এখনো প্রায় সব হিন্দু পরিবারেই এসব উপরোধের ঢেঁকি গিলতে হয়। ক'জন দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারে? অতুলদা পেরেছিলেন। পণ নিয়ে বিয়ে হচ্ছে শুনলে তিনি সে বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যেতেননা পর্যন্ত।

জাহাজে চাকরি ছেড়ে অতুলদা এক্সপোর্টের একটা এজেন্সি খুলেছিলেন—অল্পদিনেই তাতে বেশ সমৃদ্ধি ঘটল। ইদানীং কাজে খুব ব্যস্ত থাকতেন—কিন্তু মাঝে-মাঝে যখনই দেখা হয়েছে, অতুলদা সেইরকম হাসিখুশি উচ্ছল মানুষ, নিছক কেজো ব্যবসায়ী হননি। জরুরি কাজ ফেলেও আড্ডায় মশগুল হয়ে যেতে দেখেছি। ছ'মাস আগেও দেখেছি তাঁর ঈর্ষণীয় সুন্দর স্বাস্থ্য। হঠাৎ এর মধ্যে এই বদল?

জিজ্ঞেস করলাম, বল্লরী কেমন আছে এখন? ওর কী যেন অসুখ হয়েছে শুনেছিলাম, দেখতে যেতে পারিনি—

অতুলদা ক্লান্তভাবে বললেন যাস একদিন, তাড়াতাড়ির মধ্যে। ও আর বেশিদিন বাঁচবেনা।

—বাঁচবেনা? কী হয়েছে?

বল্লরী অতুলদার একমাত্র মেয়ে। এখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স। অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি! নিখুঁত সৌন্দর্য একেই বলা যায়। শুধু ফর্শা নয়, তার শরীরে একটা গোলাপি আভা, একরাশ কালো চুল প্রায় কোমর পর্যন্ত, চঞ্চল সরল দুই চোখ, যে-কোন সময় ওর ঠোঁট দেখলেই মনে হয়—যেন এইমাত্র হাসি শেষ করল। বল্লরীর শুধু একটা খুঁত ছিল, তার অতিরিক্ত ঘাম হত। শীতকালেও কুলকুল করে ঘামতে দেখেছি তাকে। সেটার আমরা কোন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু শুনলাম, বল্লরীর সাংঘাতিক অসুখ এখন।

এখন বল্লরীর অসম্ভব ঘাম হয়, সবসময় টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ে, এই বয়েসেই তার ব্লাডপ্রেসার দারুণ এরাটিক। কখনো আশি, কখনো আড়াইশো। তাছাড়া আজকাল আবার সারাদিন তিন-চারবার তার হাত-পা কাঁপতে থাকে মৃগী

রোগীর মতন, একটু বাদেই অজ্ঞান হয়ে যায়। আরো সাংঘাতিক, মাসচারেক আগে থেকে বল্লরীর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেছে, এখন সে একেবারে বোবা, একটি শব্দও বার করতে পারেনা। অমন সুন্দর মেয়েটির এই নিদারুণ রোগের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম, অতুলদা ধীরস্বরে সব বলে যেতে লাগলেন।

বল্লরীর এই অদ্ভুত অসুখ বছরখানেক আগে থেকেই ধরা পড়েছিল। এদেশের কোন ডাক্তার এর চিকিৎসা খুঁজে পাননি। সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত স্পেশালিস্ট আছে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অতুলদা। কেউ আশা দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কার কাছে শুনলেন, রাশিয়াতে এই রোগের চিকিৎসা হয়। সর্বস্ব বিক্রি করেও অতুলদা রাশিয়ায় গিয়ে বল্লরীর চিকিৎসা করাতে রাজি ছিলেন, ভারত সরকারের অনুমতিও পেয়েছিলেন, কিন্তু রুশ ডাক্তারদের চিঠিপত্র লিখে রোগের বিবরণ জানাবার পর তাঁরা জানিয়েছেন এ রোগের কথা তাঁরা জানেন বটে, এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে—কিন্তু এর কোন ওষুধ তাঁদেরও জানা নেই। তাঁরা বল্লরীকে বাঁচাতে পারবেননা—ষোলো থেকে আঠারো মাসের মধ্যে সে মারা যাবে। তাঁরাই আগে বলেছিলেন, বল্লরীর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে যাবে, অজ্ঞান হওয়া আরো বাড়বে—ক্রমশ এক-একটা প্রত্যঙ্গ অক্ষম হয়ে যাবে—রুশ ডাক্তারেরা যা উপসর্গ বলেছেন, তা একটার পর একটা ঠিক মিলে যাচ্ছে। বল্লরী বাঁচবেনা।

কিন্তু অতুলদা শুধু এতেই ভেঙে পড়েননি। তাঁর পরাজয় অন্য জায়গায়। অপমানিত, লাঞ্ছিত মানুষের মতন শুকনো হেসে অতুলদা বললেন, এই দ্যাখ! জামার হাতা গুটিয়ে তিনি দেখালেন, তাঁর বাহুতে বাঁধা নানান সাইজের একগাদা কবচ আর তাবিজ। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলামনা।

বল্লরীর নিয়তি অতুলদা শান্তভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। তার শেষ দিন ক'টি যতদূর সম্ভব আনন্দ ও শান্তিতে কাটাতে পারে—তিনি সেই চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় অতুলদার শ্বশুর কোথা থেকে এক সন্ন্যাসীকে ধরে আনলেন। সন্ন্যাসী নাকি যাগযজ্ঞ করে বল্লরীকে সারিয়ে তুলতে পারবে। অতুলদা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করেননা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা যে-রুগীকে জবাব দিয়েছে সে সেরে উঠবে ধুলোর ধোঁয়ায়। অনেক অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতির পর অতুলদা শুধু এইটুকু রাজি হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেমতন যাগযজ্ঞ যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু বল্লরীকে কোন কষ্ট দেওয়া চলবেনা আর অতুলদা নিজে সেই সময়ে বাড়ি থাকবেননা।

কিন্তু জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর শর্ত অন্যরকম। তাঁর যজ্ঞে মেয়ের বাবাকেই প্রধান অংশ নিতে হবে, হোম করতে হবে, হাতে তাবিজ ধারণ করতে হবে এবং একদিন তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যে দিয়ে থাকতে হবে। এসব শুনে অতুলদা রাগে

জ্বলে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যারা ওসবে বিশ্বাস করে—তাদের এসবে ফল ফলতেও পারে—কিন্তু আমি ওসব মানিনা ; মানিনা। আমি কিছুতেই পারবনা। অতুলদার মামাশ্বশুর, সন্ন্যাসীকে জোগাড় করার কৃতিত্ব যার—তিনি বললেন, কিন্তু বাবা, যদি মেয়েটা এতে কোনক্রমে বেঁচেই যায়, তাহলে তোমার নিজের একটু কষ্ট হলেও—

সেই সময় অতুলদার চোখ পড়েছিল দরজার দিকে। বল্লরী এসে দাঁড়িয়েছে। নীরবে ডাগর চোখদুটি মেলে আছে। কথা বলতে পারেনা বল্লরী—কিন্তু এখনো সব শুনতে পারে, বুঝতে পারে। শান্তাদি বিছানার ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শান্তাদির আর কোনরকম মনের জোর নেই, এখন তিনি যে-কোন ভরসার খড়-কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরতে চান। হঠাৎ অতুলদার মনে হয়েছিল —এখন এই সন্ন্যাসীর বুজরুকিতে যদি তিনি রাজি না হন—তাহলে শান্তাদি হয়তো সারা জীবন এই দুঃখ পুষে রাখবেন যে—অতুলদা যদি যাগযজ্ঞ করতেন—তাহলে, বাঁচতে পারত। এমনকী বল্লরীও হয়তো মৃত্যুর আগে শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় ভেবে যাবে—তার বাবা তাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেনি। সবাই ভাববে মেয়ের জীবনের চেয়েও অতুলের নিজের গোঁয়ার্তুমিটাই বড় ! শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন অতুলদা, আজীবন নাস্তিক হয়েও দুদিন ধরে যজ্ঞ করেছেন, হাতে পরেছেন তাবিজ এমনকী তারকেশ্বরেও গিয়েছিলেন।

কিছুই সুফল হয়নি, রুশ ডাক্তারদের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বল্লরীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ দিকে যাচ্ছে। বল্লরী বাঁচবেনা, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের আদর্শেরও মৃত্যু হওয়ায় অতুলদা ভেঙে পড়েছেন। তিনি এখন অন্তরে দগ্ধ ; পরাজিত মানুষ, হ্যাজাক বাতির ম্যান্টলের মতন, আকৃতি বজায় রাখলেও আসলে পোড়া ছাই।

৬

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি, আমার ঘুম ভেঙে গেল। কাল রাত্রে শুয়ে-শুয়ে বুকের ওপর একটা বই নিয়ে পড়তে-পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বইটা ঘুমের ঘোরে খসে পড়ে খাটের নিচে। আজ সকালে আমার বুকের ওপর সেই বইয়ের সাইজেরই খানিকটা রোদ্দুর !

আমার ঘুম ভাঙা দুরকম। এক-একদিন ঘুম ভেঙেও যেন ভাঙতেই চায়না ! আলস্যে চোখ টেনে থাকে, সারা শরীরে ঘুমের মাদকতা লেগে থাকে, কেউ ওঠার জন্য তাড়া দিলেও এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুই, পাশে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়

—এক চুমুক দিয়েও আবার তন্দ্রাকে প্রশ্রয় দিই। মাঝে-মাঝে এক-একদিন, ঘুম ভাঙলেই অর্থাৎ সকালবেলা প্রথম চোখ মেলে তাকাবার পরই মনে হয় সম্পূর্ণ জেগে গেছি, আর একমুহূর্তও বিছানায় থাকার ইচ্ছে হয়না, স্থির হয়ে যায় যে জাগরণ সেদিনের মতন চূড়ান্ত। কেউ ডাকেনা, তবু ধড়মড় করে উঠে বসি।

আজ এইরকম দ্বিতীয়ভাবে আমার ঘুম ভাঙল। ভালো করে ভোর হয়নি, ঈষৎ শীতের উপভোগ্য হাওয়া, ডাকবাংলোয় নিশ্চিন্ত ছুটির সপ্তাহান্ত, চাদরটা আবার গায়ে টেনে নিয়ে আজ আট-ন'টা পর্যন্ত ঘুমোলেও কেউ বাধা দেবার ছিলনা। তবু যেন আমার বিশেষ কোন কাজ আছে, যেন অ্যালার্ম ঘড়ি আমাকে জাগিয়ে তুলেছে, এইভাবে অতিদ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে চটিতে পা গলালাম।

অথচ, আমার কোন কাজই নেই। আমার সঙ্গী-সঙ্গীনীরা—তিনজন পুরুষ ও দুই নারী,—এপাশে-ওপাশের ঘরে প্রগাঢ় ঘুমে মগ্ন। জায়গাটার নাম হেসাড়ি—চক্রধরপুর ছাড়িয়ে টিলা ও জঙ্গলের মধ্যে একটা ছিমছাম ডাকবাংলো, কাল বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেচি, আজ হাতে কোন কাজ তো দূরে থাক দিন কাটাবার কোন পরিকল্পনাও নেই। তবু আমাকে এত ভোরে জেগে উঠতেই হল।

ঘুমন্ত সঙ্গী-সঙ্গিনীদের ডাকলামনা, মাঝখানের দরজা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে তাদের ঘুমন্ত, ব্যক্তিত্বহীন ও সরল নিভাঁজ সুন্দর মুখগুলি দেখলাম। কারুর গায়ের ভ্রষ্ট চাদর সরিয়ে ঠিকঠাক করে ঢেকে দিলাম, কারুর ঝুলন্ত হাত তুলে দিলাম খাটে, কোন রমণীর শাড়ির প্রান্ত প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠে যাওয়ায়—নামিয়ে দিলাম পায়ের কাছে। কেউ জাগলনা। বেশির ভাগ দিন আমিই দেরি করে উঠি, তাই বহুদিন সকালের আলোয় এতগুলি ঘুমন্ত মুখ আমার দেখা হয়নি।

ডাকবাংলার চৌকিদার কি উঠেছে? টুথব্রাস ও পেস্ট হাতে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম চৌকিদারের ঘরে দিকে। একটু চা কিংবা কফি পেলে খুব ভালো লাগত। সেটা শুধু চা বা কফির জন্য নয়। দিনের প্রথম সিগারেটটা আমি কোন গরম পানীয়ে ঠোঁট ভেজাবার আগে কিছুতেই টানতে পারিনা। অনেককে ঘুম থেকে উঠেই সিগারেট ধরাতে দেখেছি, আমি পারিনা, আমার কাশি হয়। অভ্যেসগুলো পরপর বাঁধা। টুথপেস্টের স্বাদ আমার এত বিশ্রী লাগে যে দাঁত মাজার পরই ভোঁতা মুখে চা কিংবা সিগারেট না-টেনে আমি থাকতে পারিনা। এ ব্যাপারে আমি এতই খুঁতখুঁতে যে চায়ের কাপ চোখের সামনে না-দেখলে আমি দাঁত মাজতেই যাইনা কখনো। সুতরাং পেস্ট ও টুথব্রাস হাতে নিয়ে আমি চৌকিদারের ঘরের দিকে এগোলাম।

অরণ্যের মাঝখানে এমন উন্মুক্ত পরিবেশে বাংলো, তবু চৌকিদারের ঘরখানি এমন করে বানানো হয়েছে যে দিনেরবেলায়ও সেটাতে আলো ঢোকেনা।

সপরিবারে চৌকিদার বারান্দায় খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে। ওরা কেউ জাগেনি। একটি খাটিয়ায় চৌকিদার—ঘুমের মধ্যে তার হাত-পা এমনভাবে ছড়ানো যেন মনে হয় গত রাত্রে কেউ তাকে বেদম প্রহার দিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় খাটিয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। অথচ জানি, সেরকম কিছুই ঘটেনি, কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আমাদের কাজ শেষ করে চৌকিদার সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে শুতে গেছে। তবে, তার ঈষৎ ব্যাদিত মুখের কাছে একটা নীল ডুমো মাছি ভনন্-ভনন্ শব্দে উড়ছে দেখে সন্দেহ হয়, শোবার আগে চৌকিদার নিভৃতে কিছু মহুয়ার আরক পান করেছে, সেই মিষ্টি গন্ধই মাছির আকর্ষণ। পাশের খাটিয়ায় চৌকিদারের ঈষৎ স্থূলাঙ্গী যুবতী পত্নী দুটি শিশুকে নিয়ে শয়ান। ঐটুকু খাটিয়ায় সারারাত ওরা তিনজন কী কৌশলে যে শুয়ে আছে—সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। রাতে একটি বাচ্চাও কী টিপ করে পড়ে যায়নি? চৌকিদার পত্নীও খানিকটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। এইসব অশিক্ষিত নিচু জাতীয় লোকরা সবাই ঘুমের মধ্যে মুখ খুলে থাকে—এটা আমি লক্ষ করে দেখেছি। সভ্য লোকেরা মুখ বুজে ঘুমোতে শিখে নিয়েছে। হয়তো দিনেরবেলা সারাক্ষণই তাদের মুখসর্বস্ব জীবন কাটাতে হয় বলেই, ঘুমের মধ্যে অন্তত।

সবাই ঘুমন্ত, শুধু আমি একা জেগে আছি, আশেপাশে কোথাও জাগ্রত মানুষের সাড়া নেই। অরণ্য ভেদ করে জেগে উঠেছে ডিমের কুসুম-রঙা সূর্য, এই লাল রং কী করে এবং কেন বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যায়—আমি জানিনা, না-গেলেই ভালো হত। একরাশ পাখির কোলাহল শোনা যাচ্ছে—কিন্তু এ তল্লাটে আমি এখন একমাত্র জাগ্রত মানুষ। ঘুমন্ত চৌকিদার দম্পতিকে ডাকতে হঠাৎ আমার কী জন্য যেন মায়া উপজিল। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলাম রান্নাঘরে। খুব প্রয়োজনে সামান্য চা কিংবা কফি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, যদি সব ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু এ যে কাঠের উনুন। কাঠ সাজিয়ে উনুন ধরানো আমার অসাধ্য। তাহলে থাক চা-কফি। তাহলে এখন দাঁত মাজা মুখ ধোওয়াও মুলতুবি থাক, সিগারেট খাওয়া বন্ধ।

ঠিক যে বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়েই তখন আমি একা-একা অরণ্যের মধ্যে অনেকখানি চলে এসেছিলাম, তা মনে হয়না। এত ভোরের আলোয় জঙ্গলে বেড়াবার মতন ভাবুক প্রকৃতির মানুষ আমি নই। নিশ্চয়ই আমার প্রবৃত্তিবেগ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছিল এই গোপন ইচ্ছায়—হয়তো কিছুটা জঙ্গল পেরুলেই কোন পাহাড়ি গ্রাম চোখে পড়বে, হয়তো সেখানকার দোকানে আমি পায়জামা ও চাদর জড়ানো মূর্তিতে গ্রাম্য মানুষদের সঙ্গে সোদা গন্ধযুক্ত ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিতে-দিতে একপ্রকার আনন্দ পাব। হয়তো কোন ওরাও বৃদ্ধের কাছ

থেকে বিড়ি চেয়ে আমি ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার আত্মপ্রসাদ লাভ করব। নিশ্চিত এইরকমই অভিপ্রায় ছিল আমার। কেননা, মিনিট পনেরো সেই অরণ্যের পায়ে-চলা পথ দিয়ে হাঁটার সময়েও আমি কী কী নিয়ে যেন অন্যমনস্ক ছিলাম, অরণ্যের রূপ ও সৌন্দর্যের দিকে আমার চোখ পড়েনি। তাছাড়া আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো হাঁটিনি, একটা পথের নিশানা ঠিক রেখেছিলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলে, একটা গাছ বেয়ে সরসর করে নেমে আসছে একটা হলুদ সাপ।

সাপটা বেশ বড়, অন্তত চারহাত লম্বা, সেই তুলনায় বেশ স্বাস্থ্যবান। সাপদের সমাজে হয়তো ওকে মোটা-মোটা বলে রাগায়। সাপটার গতি খুব অলস-সেটা সদ্য ঘুম ভাঙার জন্য নয়, সাপেরা রাত্রে ঘুমোয়না আমি জানি—সামনেই শীত—তখন ও বহুদিনের জন্য ঘুমোতে যাবে—সেই আলস্য। সাপটাকে দেখে আমি খুব যে বেশি ভয় পেয়েছিলাম, তা বলা যায়না। বরং সাপ সম্পর্কে আমার যে অস্বাভাবিক আতঙ্ক, তার তুলনায় তখন আমি অনেকটাই হাল্কা ও উদাসীনবোধ করেছিলাম। জানি, সাপ দেখে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা হাস্যকর, আমার হাতে কোনপ্রকার অস্ত্র ছিলনা। তবু রহস্যময়ভাবে আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট বোধ হতে লাগল, আজ সকালবেলা আমার কোন বিপদ হবেনা।

সাপটা আমাকে দেখতে পেয়েছিল। দুজনের দূরত্ব প্রায় দশহাত। গাছ থেকে সরসর শব্দ করে নেমে এসে, তখন আমি সদ্য শুকনো পাতায় শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়েছি, সাপটা আমার দিকে তাকাল। তাকাল তো তাকিয়েই রইল অনেকক্ষণ। আমিও চেয়ে আছি। হঠাৎ আমার মনে হল, সাপটা যেন আমাকে কিছু বলতে চাইল। মহাভারত-বাইবেল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সাপদের সম্পর্কে যে হাজার-হাজার উপকথা পড়েছি, হয়তো তার প্রভাবেই সাপের এই কথা বলার প্রবৃত্তির কথা আমার মনে হয়। কিন্তু কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটলনা, সাপ সেই ভোরবেলার নির্জন অরণ্যে মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠলনা, শুধু চেয়েই রইল। কিন্তু আমি তো সাপদের ভাষা জানিনা—ওদের আদৌ কোন ভাষা আছে কি না তাই জানিনা। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর সাপটা একবার ফোঁস করল। সেটাকে দীর্ঘশ্বাসও মনে করা যেতে পারে।

এবার সাপটা নড়ে উঠে বাঁদিকে বেঁকল, একটা পাতাহীন সাদা ফুলগাছের মধ্য দিয়ে গলে গিয়ে বেশ কিছুটা পরিষ্কার জায়গা দিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে লাগল, আমার দিকে আর চেয়েও দেখল না। সাপটার গতিপথ আমি চোখ দিয়ে অনুসরণ করছি, এবং সে একটু দূরে যাওয়ার পরই আমি একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে সশস্ত্র হইনি। কিন্তু সাপটা ক্রমশই দূরে যেতে লাগল, আমি তাকে ভালো করে দেখবার জন্য একটু এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। এই প্রথম আমি লক্ষ করলুম,

ভোরবেলাকার অরুণবর্ণ রোদে সেই অপসৃয়মাণ হলুদ প্রাণীটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মাঝে-মাঝে খসে-পড়া পাতার রাশির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ও আবার বেরিয়ে আসছে তকতকে জমিতে, ও যাতে আমার চোখ থেকে হারিয়ে না-যায় —আমি বেশ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। পাথরগুলো এবার একটু ঢালু হয়ে এসেছে, খানিক পরেই একটা মরা ঝর্না কিংবা ছোট নদীর খাত, লাল টুকটুকে পর্টুলেকা ফুল ফুটে আছে অনেক, কী এক অনির্দিষ্ট কারণে একঝাঁক ফড়িং ওড়াউড়ি করছে সেখানে—ও জায়গাটা ছেড়ে ফড়িংগুলো নড়ছেনা। সাপটা সেই ঝর্নার খাতে নেমে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

হয়তো আশেপাশে আরো সাপ আছে কিনা এই দেখার জন্যই আমি এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। তখন সেই অরণ্যের বিশাল সৌন্দর্য আমাকে চেপে ধরল। আমি প্রকৃতিপ্রেমিক নই, পৃথিবীতে কেইবা আর—আমি অন্যমনস্কভাবেই জঙ্গল দিয়ে হাঁটছিলাম—কিন্তু সেই হিংস্র সাপের আকস্মিক উপস্থিতি যেন আমার নাকে একটা ঘুঁষি মেরে বলল, এবার দ্যাখ!

চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে আমার মনে হল, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় সেই অরণ্যযেন এক রহস্যময় সৌন্দর্যের খনি। প্রথমেই আমার চোখে পড়ল, একটা ভেলভেটের মতন কালো রঙের রোমশ মাকড়শা। এই জীবটিকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। কিন্তু এই পাহাড়ি মাকড়শা—এর চেহারা একেবারে অন্যরকম—একে বলতেই হয় তুমি সুন্দরী। বিশেষত সাদারঙের যে একঝাঁক পরগাছা ফুলের পাশে ও বসে আছে, তাতে ওকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। গাছগুলোর মাথার দিকে রোদ্দুর, নিচে এলোমেলো ঝাপসা রং ফাঁক দিয়ে, ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে লাল-লাল শিখা, একটা ভাঙা পাথরের টুকরো জ্বলছে হীরের মতন, একদল বুনো পাখি কুচিটাং-কুচিটাং বলে চেঁচিয়ে উঠতেই দূরের গাছ থেকে একটা অদেখা-পাখি সাড়া দিল টুটি-টু-টি-টুঁ। অরণ্যে এসে কেউ প্রতিটি গাছকে দেখেনা—কিন্তু তাঁদের গম্ভীর অস্তিত্ব দেখে মনে হয়—তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পৃথক—অমন কঠিন শালগাছ —কিন্তু তাদের সদাফোটা বল্লরী দেখলে মনে হয়—পৃথিবীতে এরই নাম পবিত্রতা। গাছ থেকে ঘুরতে-ঘুরতে পড়ল একটা সবুজ রঙের পালক—ওপরে তাকিয়ে দেখি একটা হৃষ্টপুষ্ট টিয়াপাখি ব্যগ্রভাবে আমাকে দেখছে। গলায় বহুরঙা একটা গিরগিটি তার থেকে মাত্র আধহাত দূরে—কিন্তু পরস্পর শিকার-শিকারী নয়।

আরো কিছুক্ষণ সেই জঙ্গলে আমি ছিলাম। বস্তুত সেই নিভৃত সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত বা মুগ্ধ করেনি, আমার মনকে শান্ত প্রসন্ন করেনি। সেই সৌন্দর্যের মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতা আছে। একটু দূর হেঁটে, বাঁধানো পথের পাশে একটা কালভার্টে বসে দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে আমার মনে হল, বহুদিন আমি

এত নিঃসঙ্গ থাকিনি। জল যেমন জলকে চায়—মানুষও মানুষ চায়। বাইরে বেড়াতে এলেও আমরা বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের মধ্যেই তো থাকি। একা এলেও প্রবাসে কারুর সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ব্যগ্রতার শেষ থাকেনা। নিরালা ঘরেও শুধু মানুষের কথাই ভাবি। একা-একা কোন বিখ্যাত সৌন্দর্য দেখলেও মন ভারী হয়ে আসে। মানুষ বাঁচেনা—আমি বাঁচতে পারিনা। এই যে এই অরণ্যের মধ্যে আমি কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে ছিলাম, ঘাসফুলের অপূর্ব বর্ণলীলা আর প্রতিটি গাছের পাতায় বিভিন্ন সবুজ আভা দেখে আমি রূপের জগতে ঢুকে গিয়েছিলাম—তার ফলেই আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমার আজ, এই মুহূর্তে কোন অভাব নেই, মন খারাপের কোন কারণই নেই, কিন্তু ঐ নিভৃত সৌন্দর্য মনকে ভার করে দেবেই। জঙ্গলে এসে কখনো আমি রূপ খুঁজিনা, কিন্তু আজ এই ঘুমন্ত পৃথিবীতে আমাকে একা পেয়ে অরণ্য যেন নির্লজ্জার মতন তার ফ্যাশান প্যারেড দেখিয়ে নিল।

অদূরে কলশব্দ শুনে চমকে তাকালাম। কয়েকটি পাহাড়ি নারী-পুরুষ মাথায় বোঝা চাপিয়ে কোথায় যেন চলেছে। জীবন্ত মানুষের সাড়া পেয়ে হঠাৎ আমার খুবই ভালো লাগল। মনে হল, ওদের মধ্যে একটি পাহাড়ি যুবতীর গ্রীবায় যে লাবণ্য, তার তুলনায় একটু আগে দেখা শ্বেত ফুলের স্তবক কিছুইনা।

৭

ভদ্রতা-অভদ্রতার কতগুলো সূক্ষ্ম প্রশ্ন আছে, আমি সেগুলোর উত্তর কিছুতেই খুঁজে পাইনা। কারুর কাছে তো এসব জিজ্ঞেস করাও যায়না।

প্রথমে ঘটনাটা বলি।

আমরা দুই বেকার বন্ধু দুপুরবেলা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছিলাম। দুপুরবেলা সারা পাড়া জুড়ে শুধু মেয়েদের রাজত্ব থাকে, মহিলারা এ ছাদ থেকে ও ছাদে গল্প করেন কিংবা পা ছড়িয়ে ডাঁটা চিবোন, অনেকে ব্লাউজ খুলে আদুল গায় থাকেন —কলকাতায় বেশিরভাগ পাড়াই দুপুরে প্রমিলা-রাজত্ব—এসময় আমার মতন পুরুষ মানুষের বাড়িতে বসে থাকা মানায়না, তাই কাজ না-থাকলেও রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি। সুবিমলও বেকার, সুতরাং দুজন সঙ্গী মাঝে-মাঝে কোন-কোন চাকরিঅলা বন্ধুর অফিসে যাই ঠিক টিফিনের একটু আগে। সেদিন সুবিমল আর আমি রণবীরের অফিসে যাব ঠিক করলুম।

রণবীর আমাদের দেখে খুশিই হয়েছিল। নিজের মামার ফার্মে রণবীর অফিসার হয়েছে, কাজকর্ম বিশেষ করতে হয়না, আমাদের পেয়ে আড্ডা দিতে

উৎসুক হয়ে উঠল। আড্ডার মাঝখানে শুধু চা আনতে পাঠাচ্ছিল রণবীর, সুবিমল আমার দিকে চোখ টিপলে আমি তখন বলেই ফেললাম, শুধু চা কী? রণবীর সঙ্গে কিছু খাবার আনতে দে!

রণবীর ব্যস্ত হয়ে বলল, তোদের খিদে পেয়েছে? ক্যান্টিনে ডিমের চপ হয়েছে বোধহয়, দাঁড়া—। রণবীর দুটাকার ডিমের চপ আনতে দিতে আমরা অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে আবার আড্ডা শুরু করলুম।

অফিসের বেয়ারাদের একটা স্বভাব এই চা আনতে পাঠালে তারা সোজা চলে যায় দার্জিলিং-এ, ডিম আনতে পাঠালে একেবারে মাদ্রাজ। খাঁটি জিনিশ আনতে হবে তো! সুতরাং, আমাদের আড্ডা ম্যারাথন রেসের মতন চলতেই লাগল, খিদেয় আমার পেট ছিঁড়ে ফেলছে একেবারে। এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলেন, না, বেয়ারা নয়, পরেশবাবু, হাতে ফাইল। বুড়োমতন, নিরীহ এই লোকটিকে আমি আগেও রণবীরের অফিসে দেখেছি, লোকটি রণবীরের থেকে নিচু পোস্টে কাজ করেন। লোকটি একটু বেশি কথা বলেন এবং এক কথা দু-তিনবার না-বললে বোঝেননা। অন্যদিন লোকটি চলে যাবার পর রণবীর বলে, জ্বালাতন! এমন বকবক করে!

সেদিন পরেশবাবু ঢুকতেই রণবীর আমাদের বসতে বলে, তাড়াতাড়ি তাঁকে বিদায় করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। পরেশবাবু ফাইল খুলে বোঝাতে লাগলেন, শুনে মনে হল ব্যাপারটা খুব জরুরি, সেদিনই দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে—ইত্যাদি। রণবীর ফাইল দেখছে, এমন সময় বেয়ারা ঢুকল, হাতে কেটলি এবং একটা প্লেটে বেশ বড়বড়, বোধহয় রাজহাঁসের ডিমের চপ পাঁচটা। আমি আর সুবিমল কী নিয়ে যেন ফিসফাস করছিলাম, রণবীর বলল, নে, খা। আমরা দুজনে দুটো তুলে নিলাম, রণবীরও একটা তুলে কামড় বসিয়ে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। এতবড় ডিম একটা খেলেই যথেষ্ট। সুবিমল তবু আর-একটা তুলে নিল। প্লেটে তখনো একটা পড়ে আছে—একটু বাদে রণবীর কথা থামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে ওটা খাবিনা? রণবীরের চোখ একমুহূর্তে থমকে গেল, সেই চোখে আমি কী যেন একটা মারাত্মক বিপদের ইঙ্গিত দেখলাম, আমার আর চিন্তা করার সময় ছিলনা, আমি অতি দ্রুত বলে উঠলাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি ওটা খাব। আমি খপ করে তুলে নিলাম।

পরেশবাবু সেইসময় ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে স্যার, আপনাকে বিরক্ত করলুম।—আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম পরেশবাবুর গলাটা একটু-একটু কাঁপছে, যাবার সময় তিনি এক পলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গেলেন।

পরেশবাবু নিশ্চয়ই সারাজীবন আমাকে একটা বিষম লোভী এবং অতি বদ লোক ভাববেন। অতবড় রাজহাঁসের ডিম দুটো আমি বকরাক্ষসের মতো গপ্‌গপ্‌ করে গিলছিলাম ওঁর সামনে বসে। কিন্তু, প্রশ্নটা এই, আমার কী করা উচিত ছিল সেদিন ? কোন্‌ ব্যবহারটাকে ঠিক ভদ্রতা বলা চলে ? সেই সামান্য ঘটনাটা নিয়ে আমি বছরের পর বছর ভাবি।

পরেশবাবুকে প্রথমেই অফার করা উচিত ছিল রণবীরের। সে তা করেনি, যে কোনো কারণেই হোক। হয়তো রণবীরটা এমনই প্রচণ্ড স্নব যে অধঃস্তন কর্মচারীকে খাবার অফার করতে তার মানে বাধে। তাহলে কী আমার বা সুবিমলের উচিত ছিল অফার করা ? সুবিমল পরেশবাবুর পাশে বসে ছিল, আমি ভেবেছিলাম সুবিমলই বলবে—কিন্তু সুবিমল বলেনি। ও হয়তো প্রতীক্ষায় ছিল, আমি বলব। আমি অনেক ভেবেচিন্তেই বলিনি, পাছে সুবিমল মনে করে ওর থেকে আমি বেশি ভদ্র সাজবার চেষ্টা করছি ! (এরকম মনে করার কারণ আছে, একটু পরে সে ঘটনা বলছি।) খাবার অফার করার একটা সময় আছে, সেই সময়টা পেরিয়ে গেলে আর বলা যায়না। ভাবতে-ভাবতে সেই সময়টুকু পেরিয়ে গেল, আমি রণবীর, সুবিমল তিনজনেই চপে কামড় বসিয়েছি—তারপর পরেশবাবুকে খেতে বলা যেন অভদ্রতা। রণবীর আরো মারাত্মক কাণ্ড করতে যাচ্ছিল, যখন একটা পড়ে আছে—তখন রণবীর যে প্রশ্ন করল—সেসময় রণবীরের চোখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি আমি না-খাই—তাহলে ও পরেশবাবুকে অফার করবে ! একজন মধ্যবয়স্ক প্রৌঢ়, বাড়িতে হয়তো তাঁর তিন-চারটি সন্তান আছে, আমার বয়সী কোন ছেলে থাকাও বিচিত্র নয়—শুধু একটা নিচু চাকরি করেন বলেই পড়ে-থাকা ডিমের চপ তাঁকে খেতে বলা হবে—এটা আমার কাছে একটা দারুণ অভদ্রতা মনে হয়েছিল। সেইজন্যই রণবীরকে বাঁচাবার জন্য সেটা আমি তুলে নিয়েছিলাম। অথচ, পরেশবাবু চলে যাবার পর, রণবীর আমাকে বলল, কী পেটুক হয়েছিস রে আজকাল ? অতবড় একটা ডিম ফট করে মুখে পুরে দিলি ? সুবিমল ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে লাগল ! আমি অপ্রস্তুত হয়ে ব্যাপারটা ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলুম, বললুম, তোরাই তো অসভ্যের মতন...। রণবীর বলল, ভ্যাট বাজে বকিস না। অসভ্য আমি না তুই ? লাস্ট চপটা পরেশবাবুকে দিলে উনি কী আবার মনে করতেন ? কিচ্ছু না।

তাহলে আমারই ভুল ? বুঝতে পারিনা। পরেশবাবু সত্যিই তাতে কিছু মনে করতেন না ? কোনদিন এর উত্তর পাবনা। আমি তো ভেবেছিলাম, পরেশবাবু আমাকে লোভী ভাবেন ভাবুন কোন ক্ষতি নেই—আমার সঙ্গে তো আর দেখা হচ্ছেনা। নিজের অফিসের রণবীরকে যাতে অভদ্র বা রূঢ় না-ভাবেন সেজন্যই আমি...।

ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্নে আমি দিশাহারা হয়ে যাই! অন্যের সামনে বেশি ভদ্রতা দেখানোও একধরনের অভদ্রতা কিনা বুঝতে পারিনা। এবার আগের ঘটনাটা বলি।

সুবিমল আর আমি একদিন বাসে করে ফিরছিলাম রাত্তিরবেলা। খুব বেশি ভিড় ছিল না, বসার জায়গা পেয়েছিলাম। লেডিস সীটের কাছাকাছি কী যেন একটা বচসা হচ্ছিল— আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। বাসের ঝগড়ায় সাধারণত কান দিইনা, কিন্তু লেডিস সীটের কাছে যখন, হয়তো কোন রসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—এই হিশেবে উৎসুক হয়েছিলাম। কিন্তু তাকিয়ে দেখি ব্যাপারটা বড়ই নীরস। একজন প্রৌঢ়া মহিলা ভাড়া দিতে পারছেন না, কণ্ডাকটর তাঁকে নামিয়ে দিতে চায়।

মহিলাটির চুল কদমছাঁটা, পরনের শাড়িটা মূল্যবান কিন্তু বেশ ময়লা, কথা শুনে মনে হল মহিলাটির একটু মাথার গোলমাল আছে। কাচুমাচু মুখে মহিলাটি বলছেন, কাল পয়সা দেব বাবা, আজ নেই বাবা, আমার মেয়ের বাড়িতে গেলেই টাকা পাব—তখন তোমার ডবল পয়সা দেব— । কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে বলছে, নামুন, নেমে যান, রোজ-রোজ, নামুন।

—নামব কেন? মেয়ের বাড়িতে যাব, মেয়ে আমার কত যত্ন করবে—

—হাঁ, মেয়ে আপনাকে সিংহাসনে বসাবে! হেঁটে যান, আরো লেডিজ দাড়িয়ে রয়েছে, আর উনি জায়গা জুড়ে...রোজ-রোজ ভাল্লাগেনা...নামুন—

—ইস পয়সা দিইনি বলে বসবনা কেন? ওরা বসবে? ভারী আমার পয়সার গরম!

—ইস, এই পাগলীকে নিয়ে তো মহাঝঞ্ঝাট! ইনসপেকটার এসে আমাকে ধমকাবে—এবার জোর করে নামিয়ে দেব বলছি...

মহিলাটিকে দেখে আমার একটু অন্যরকম লাগছিল। এলাহাবাদে আমার এক পিসিমা থাকতেন, তাঁর মুখের সঙ্গে মহিলাটির খুব মিল। আমার সেই পিসিমা অবশ্য দশ বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু মহিলাটিকে দেখে পিসিমার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল, পিসিমা আমাকে একটা নীল সোয়েটার বুনে দিয়েছিলেন, যেবার এলাহাবাদে যাই, সেবার পিসিমা আমাকে...

হঠাৎ দেখলাম কণ্ডাকটর ঘটাং করে বেল বাজিয়ে থামিয়েছে এবং একরকম জেদের মাথাতেই সেই মহিলার হাত ধরে নামিয়ে দিতে যাচ্ছে। আমি আর কিছু ভাবিনি, জোরে চেঁচিয়ে বললুম, এই যে, কণ্ডাকটর ওকে ছেড়ে দিন। ওর কত ভাড়া, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

কণ্ডাকটর আমার দিকে ফিরে বলল আপনি ভাড়া দেবেন কেন? ভাড়ার

জন্য নয়, জানেননা, রোজ এই সময়টাতে এমন ঝঞ্ঝাট করে—

আমার হঠাৎ অকারণেই রাগ হয়ে গেল। ধমকে বললুম, আপনার অত কথা তো আমি শুনতে চাইনি! ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি চুপ করে থাকুন। ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দিয়ে...

কণ্ডাকটর টিকিট কাটল, মহিলাটি আমার উদ্দেশে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, রাজরাজেশ্বর হও...

কয়েকস্টপ পরে নামলাম। সুবিমল আমার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে বলল, তুই সিনেমায় নেবে যা!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কী ব্যাপার?

সুবিমল বলল, কীরকম বাসসুদ্ধ লোকের সামনে হীরো সেজে গেলি—সেইটা দেখলাম। একেবারে বাংলা নভেল, উদার যুবক, আদর্শবাদী, আবার লেকচার...সবাই তোর দিকে তাকিয়েছিল, তাই একেবারে গর্বে...

—মোটেই না। ভদ্রমহিলার হাত ধরে টেনে নামাচ্ছিল ও সময় কিছু একটা...

—তা বলে ওরকম অভদ্রের মতন চেঁচাবি? এই দ্যাখ—

সুবিমল হাত তুলে দেখাল, ওর হাতে একটা সিকি। বলল আমি নিজেই উঠে গিয়ে কণ্ডাক্টরকে টিকিটটা দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই তুই হীরো সাজবার জন্য চেঁচিয়ে সরগরম করলি। আমার কথা ভুলেই গিয়েছিলি...আমার দিকে একবার তাকাসওনি।

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। বললাম, তা নয়, সুবিমল বুঝলি না, ভদ্রমহিলার হাত ধরে টানছিল, থাকতে না-পেরে, মানে, একটা ভদ্রতা-সভ্যতার ব্যাপার...

—ওকে ভদ্রতা বলেনা। পাশে বন্ধু বসে আছে, তার তুলনায় নিজে বেশি উদার কিংবা ভদ্র সাজার চেষ্টা এটাও একটা অসভ্যতা।

—অতটা ভাবিনি, জানিস, ওঁকে দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ছিল...সুবিমল আবার মাঝপথে কী ভেবে হেসে উঠল। আমার পিঠে একখানা বিরাট কিল মেরে বলল, হারামজাদা ওর জন্য টাকা ভাঙিয়ে টিকিট কাটলি দেখলাম। তাহলে আগে আমার টিকিট কাটিসনি কেন? সে বেলা বুঝি একটু উদার হওয়া যায় না, না?

৮

গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। গলির মুখে দেখি, পাশের এক ফালি জমিতে এক ঝাঁক শিউলি ফুল ঝরে আছে। দেখেই মনে হল, শরৎকাল আসার আর দেরি

নেই। অন্ধকার রাত, ওই ফালি জমি যেন এক টুকরো আকাশ, ফুটফুটে নক্ষত্রের মতো এক রাশ শিউলি। আমি রিকশাওলাকে বিদায় দিয়ে ওখানেই নেমে পড়লাম।

কুড়িয়ে দু-হাতের মুঠোয় তুলে নিলাম অনেকগুলি। ঘ্রাণ নিলাম। এরা শরতের অগ্রদূতী, পূর্ণ শরতের নয়, কেননা, বোঁটা এখনো সবুজ, জাফরানি রং ধরেনি।

মাঝরাত্রে বাড়ি ফেরার পথে, দ্রুত না বাড়ি ফিরে, আমি শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছি, কীরকম যেন লজ্জা করতে লাগল। এ যেন বেশি-বেশি কবিত্ব। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও আমাকে দেখছেনা, কেউ কোথাও জেগে নেই। তবু ভালো। কবিত্ব জিনিশটা আজকাল সর্বসমক্ষে আর আস্বাদ করা যায়না, ফোঁড়ার মতো লুকিয়ে রাখতে হয় ব্যাণ্ডেজের নিচে! প্রতিদিন সারাদিন আমিও আর সব আধুনিক মানুষের মতো কবিত্বহীন, স্পষ্ট সপ্রতিভ নৈর্ব্যক্তিক, একজন মানুষের দুঃখের কথা, শুনলে তৎক্ষণাৎ অভিভূত না-হয়ে, সামগ্রিক মানুষের দুঃখদুর্দশার বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় মেতে উঠতে পারি। কিন্তু এখন আমি একা, আমাকে কেউ দেখছেনা—সুতরাং শিউলিফুল হাতে নিয়ে দাঁড়ালে আমার আধুনিকতা নষ্ট হবেনা। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

শহরতলির সম্পূর্ণ নিঃশব্দ মধ্যরাতে সেই শিউলিফুল দর্শনে অকস্মাৎ আমার বুকটা মুচড়ে উঠেছিল। আমি শুনতে পেয়েছিলাম, কোথায় যেন একটা সরু রিনরিন শব্দ হচ্ছে। শিউলিফুল তৎক্ষণাৎ আমাকে ফিরিয়ে দিল বাল্যকাল, আমার জন্মস্থানের কথা মনে পড়ল।

রেলে খুলনা পর্যন্ত, তারপর স্টিমার। তখন আমরা স্টিমারকেই জাহাজ ভাবতাম—ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে প্রায়ই মনে হত, নদী পেরিয়ে একদিন এ জাহাজ পথ ভুলে সমুদ্রে চলে যাবে। বর্ষার দিনে পদ্মাকেই মনে হত সমুদ্র —চোখদুটিকে দূরবীনের মতো সরু করে একটি বালক দূরে তাকিয়ে থাকত প্রাণপণে। ওপার দেখা যাবে কী দেখা যাবে না? হে ভগবান, যেন ওপার দেখা না-যায়—তাহলেই সমুদ্র আবার নদী হয়ে যাবে। বাবার পাশে বসে একজন পুরুতশ্রেণীর লোক ভ্যান-ভ্যান করছে—মাস্টারমশাই বেশি করে প্যালুড্রিন এনেছেন তো? গ্রামের চারটি মানুষের উবগার হবে। ওসব কুইনিন টুইনিন কিছু না প্যালুড্রিন যা বেরিয়েছে—ম্যালেরিয়ার গুষ্টির পিণ্ডি করে ছাড়বে এবার। একেবারে মোক্ষম। কম্পাউণ্ডার বিষ্ণু আবার তাক বুঝে দেড়া দাম নেয়। বামুনের ছেলে—চামারের মতো ব্যবহার। আমি তো এক গ্রোস—। স্টিমার থামবে মাদারিপুর, ভোরবেলা। আগের সারাদিন খাওয়া হয়নি—ফলমূল আর রুটি-তরকারি ছাড়া, কিন্তু ভাত ছাড়া আবার খাওয়া নাকি। একটিমাত্র হোটেল খুলেছে

তখন খেসারির ডাল, বেগুন ভাজা আর ইলিশ মাছ—বাবা খেতে-খেতে আমাকে ধমকে বললেন, ইস দেখো, নতুন জামাটায় ঝোল লাগিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে বলবিনা—কোন দোকানে খেয়েছি। এটা কায়স্থদের হোটেল !—মাদারিপুর থেকে আবার নৌকো।

শিউলিফুল হাতে নিয়েই কেন মনে পড়ল বাল্যকালও জন্মস্থান ? প্রত্যেক বছর পুজোর সময় যেতাম, তাই আমার জন্মস্থান শিউলিফুল-চিহ্নিত। প্রত্যেকবার নৌকো থেকে নেমেই দেখেছি, দরদালানের পাশে দু-তিনটি মেয়ে শিউলিতলায় ফুল কুড়িয়ে কোচড়ে তুলছে। আমাদের নৌকো দেখেই উৎসুক ডাগর আঁখি মেলে তাকাত। আমি কলকাতাফেরৎ বালক, সুতরাং বিলেতফেরতের ভঙ্গিতে কিছুটা অহঙ্কারময় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলতাম, কিরে ?—প্রথম দিনটা অন্তত, কলকাতার ছেলেমেয়েদের মতো চেনবসানো হলদে তুলোট গেঞ্জি পরে গর্বভরে সেই গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে।

কতদিন যাইনি আর, পনেরো-ষোলোবছর, আর হয়তো কোনদিন যাবওনা, ইহজীবনে হয়তো আর আমার জন্মস্থান দেখার সুযোগই হবেনা। আজকাল আর মনেও পড়েনা। মনে পড়লেই তো ক্রোধ আর অভিমান আর দুঃখ। কে আর হৃদয় খুঁড়ে ওসব জাগাতে চায় ? তার বদলে ভিয়েৎনামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ভালো। বার্লিনের দেওয়াল নিয়ে প্রচুর তর্কাতর্কি করা যায়। আমার ব্যক্তিগত দুঃখ আমারই গোপনে থাকে। জন্মস্থান নিয়ে কথা বলতে গেলেই লোকে বলবে, ওসব খেলো কবিত্ব ! আজকের মানুষ যখন বিশ্বনাগরিক হতে চলেছে—। তাহলে ব্যক্তিগত দুঃখের নামই কবিত্ব ?

নিঃশব্দ রাত্রির শিউলিফুল আমার জগৎ ঢাকের শব্দে ভরিয়ে দিল। আমি শুনতে পাচ্ছি অবিরাম ঢাকের শব্দ, আর কয়েকটি ছাগলের চিৎকার। চক্রধরের নৌকো ঘাটে বাঁধা, তাই দেখতে আমি পায়ের নতুন জুতোর ফোস্কার কথা ভুলে ছুটে গেছি। প্রতিমা দো-মেটে হয়ে গেছে, এবার মুখ বসানো হবে। চক্রধরকে মনে হত ম্যাজিসিয়ান, ওর নৌকোয় হাজারটা নারকোলের খোলে হাজাররকম রং। আর সবার বাড়ির ঠাকুরের ছাঁচের মুখ, শুধু আমাদের বাড়িতেই চক্রধর প্রত্যেকটি মুখ নিজের হাতে মাটি টিপে-টিপে আমাদের চোখের সামনে বানাত। কী অহংকার ছিল চক্রধরের, মূর্তির মুখ বসাবার সময় সে এমন প্রকাশ্যে বিড়ি খেত যে গ্রাহ্যই করতনা কর্তাবাবুরা কাছাকাছি আছেন কি না ! আমরা প্রত্যেকেই ভাবতাম—দেবীর মুখ শুধু আমারই দিকে আলাদাভাবে তাকিয়ে আছেন। আমি ডানদিকে গেলেও তাঁর চোখ আমার দিকে ফেরানো আমি বাঁদিকে গেলেও। চক্রধরের গড়া মূর্তি দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেছিলেন, পিটি, ইউ ইমার্স দিস

ওয়ার্ক অব আর্ট !—আরেকবার আমার কলেজে-পড়া মামাদের অনুরোধে বানানো হয়েছিল মিলিটারি—হাতে রাইফেল, আর কার্তিকের মুখখানা হয়েছিল অবিকল সুভাষ বোসের মতন, সেবার সেই ম্যাজিস্ট্রেটই খবর পেয়ে এসে মূর্তি ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। রাতারাতি নতুন মূর্তি গড়া হল, আমার দাদুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন বলেই, সেবার সিডিসনের অভিযোগে কারুকে গ্রেপ্তার করেননি।

একমাস আগে থেকে চারটে কালো পাঁঠা কিনে রাখা হয়েছে। অষ্টমীর দিন দুটো আর সপ্তমী ও নবমীতে একটা করে বলি হবে। আমাদের ওপর ছিল ওদের তদারকির ভার। আমরা ঘাস খাওয়াবার নাম করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতাম। ঠাকুরদার বন্ধু বুড়ো নাসিরউদ্দিন মিঞা হেসে বলতেন, পোলাপানের কাণ্ড ! ছাগলের যেন চোট না-লাগে। মায়ের পুজোয় নিখুঁত পাঁঠা লাগে কিন্তু !—ছাগলগুলোর এমন বেয়াড়া স্বভাব, ঘাসের বদলে ধানপাতা খেতেই ওদের লোভ বেশি। কথায়-কথায় ওরা ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ত। কচি-নধর ধানপাতায় কী ধার ! আমি একবার ধানগাছ ধরে টান দিতেই ব্লেডের মতো ধানপাতায় আমার বুড়ো আঙুলটা কেটে এত ফাঁক হয়ে গেল যে, সাতদিন ন্যাকড়া বেঁধে রাখতে হল। সেবার পুজোর বলির পাঁঠা নিখুঁতই ছিল, কিন্তু আমি খুঁত ছিলাম !

অমন ধারালো ধানপাতা খেতে ওদের একটুও কষ্ট হতনা দেখে আমার ক্ষীণভাবে মনে হত, রামদার কোপ যখন ওদের গলায় পড়ে—তখনো ওদের কষ্ট হয়না ! ঢাক-ঢোল-কাঁসির প্রবল আওয়াজের মধ্যে ডুবে যেত ওদের চিৎকার। একবার রক্ত ছিটকে লেগেছিল প্রতিমার পায়। তখনো আমি রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' পড়িনি এবং শরীরে প্রথম রিপু জাগ্রত হয়নি—তাই ওসব দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা স্পর্শ করতনা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলি দেখতাম। আমাদের মধ্যে শুধু একজন, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে, শেফালি, ও দৃশ্য সহ্য করতে পারতনা। পুজোর দিন সকালে নতুন শাড়ি-আলতা-পরা পায়ে আনন্দে ছুটোছুটি করত শেফালি। সবসময় আমার পাশে-পাশে থাকত। বলিদানের সময়ের একটু আগে থেকেই ও গম্ভীর ও শান্ত হয়ে উঠত আস্তে-আস্তে। তারপর পাঁঠাটাকে স্নান করাবার সময় থেকেই শেফালি অদৃশ্য হয়ে যেত। লুকিয়ে থাকতো কোন গোপন ঘরে। শেফালির এই দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করত অনেকে। কী আশ্চর্য, আমিও এ নিয়ে ঠাট্টা করেছি শেফালিকে। শেফালি সবার বিদ্রূপের মধ্যে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকত—ওর একরাশ কোঁকড়া চুলের মধ্যে প্রস্ফুটিত কচি বিষণ্ণ মুখখানি আজও আমার মনে পড়ে। জগন্নাথ মামা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও রুক্ষ ধরণের মানুষ, তাঁর রসিকতাজ্ঞান ছিল বিকট। তিনি একবার জোর করে শেফালিকে হিড়হিড় করে

টেনে এনেছিলেন বলিদানের সময়। শেফালি অজ্ঞান হয়ে যায়। সেদিন থেকে ও মহাপ্রসাদ বা অন্য সময়ের পাঁঠার মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে ও বলির সময়ে চলে যেত—বাঁশবাগানের আড়ালে যেখানে ছিল আমাদের বাড়ির ছোট বাথরুম ও বড় বাথরুম। সেখান থেকে আর কেউ ওকে ধরে আনতে পারতনা। সেই তখন থেকেই শেফালির এমন কোমল মন ছিল যে, কালীপুজোর সময় কুকুরের লেজে ফুলঝুরি বেঁধে আমাদের খেলা ও একেবারে সহ্য করতে পারতনা, ছুটে এসে আমাদের বাধা দিতে চেয়েছে, আঁচড়ে-খিমচে অস্থির করেছে আমাদের।

একি, শিউলিফুল আমাকে মনে পড়াল শেফালির কথা? সেইজন্যই সরু রিনরিন শব্দে আমার বুক মুচড়ে উঠেছিল! কী ভুল করেছি রিকশা থেকে নেমে এসে শিউলিতলায় একা দাঁড়িয়ে! শেফালিকে আমি কিছুদিন আগে দেখেছি হাবড়ার উদ্বাস্তু কলোনিতে। না, না, আমি দেখিনি। তার কথা আমি আর কিছু বলতে পারবনা—অসম্ভব আমার পক্ষে! না, ওসব কথা আর আমি মনে করতে চাইনা।

৯

যেমন কুকুর-বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে রাখে সেইরকমই বাচ্চা ছেলেটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে দড়ির একপ্রান্ত আবার বাঁধা আছে জানালার শিকে! বাচ্চাটা রকের ওপর বসে খেলছে।

বেশ ভালো ব্যবস্থা। আমাদের গলির মোড়ের বড় বাড়িটার রকে আমি বাচ্চাটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাই। একটা ঠিকে ঝি চার-পাঁচ বাড়িতে কাজ করে, সে বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ব্যবস্থাটা সত্যিই ভালো বলতে হবে। ঐ ঝিয়ের পক্ষে হয়তো বাচ্চাটাকে বাড়িতে রেখে আসার অসুবিধে আছে—ঐটুকু বাচ্চাকে একা বাড়িতে ফেলে আসা যায়না। বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে কাজ করাও যায়না। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময়ে একটা বাচ্চা সঙ্গে থাকলে চলবে কেন? তাতে বাড়ির মালিকরা বিরক্ত হবে—তাছাড়া ঝিয়ের বাচ্চা যদি বাড়িময় ঘোরে কিংবা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চ্যাঁচায়—সেটা বাড়ির মালিকদের পছন্দ না-হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং বাচ্চাটাকে বাড়ির বাইরে বসিয়ে রেখে যায়। আর বাচ্চা যাতে রক থেকে গড়িয়ে না-পড়ে কিংবা গাড়ি ঘোড়ার রাস্তায় গিয়ে না-পড়ে, সেইজন্য বেঁধে রাখা। ক্যাঙারুর পেটের থলিতেই বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা আছে, মানুষের তো

তা নেই—সুতরাং কী আর করা যাবে। প্রত্যেকদিন সকালে ঝি কাজ করতে এসে বাচ্চাটাকে রকের ওপর বসায়, শক্ত নারকোল দড়ি দিয়ে ওর পেটের সঙ্গে বেঁধে জানালার শিকে আবার বেঁধে দেয়। তারপর বাচ্চাটাকে বলে চুপটি করে বসে থাকবি নড়বিনি বলচি !—বাচ্চাটার অভ্যেস হয়ে গেছে—সে জুলজুলে চোখে পথের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে—মুখ দিয়ে অবিশ্রান্ত লালা গড়ায়। কখনো তার মা খানিকটা মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে যায় বাচ্চাটা খুঁটে-খুঁটে খায়। খুবই যুক্তিসঙ্গত, নিরাপদ ব্যবস্থা বলা যায়।

কিন্তু মানুষের মন তো বড়ই উদ্ভট। সেই জন্যই মাঝে-মাঝে ঐ বাচ্চাটাকে দেখে আমার কষ্ট হয়। গরু-ছাগল-কুকুরের মতন মানুষকেও দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখা—আমি ঠিক সহ্য করতে পারিনা—অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, আহারে! পরক্ষণেই নিজের ওপর আমার রাগ হয়। মনে হয়, আমি দয়ামায়ার ফ্যাশান দেখাচ্ছি ! আজকাল দয়ামায়া জিনিসগুলোও বুঝেসুঝে খরচ করা উচিত—তা নিয়ে বিলাসিতা করা মোটেই চলে না। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তুলনা করে হাহুতাশ করাও আমার পক্ষে ন্যাকামি। পৃথিবীতে কত জায়গায় কত মানুষ যে গরু-শুয়োরের খোঁয়াড়ের চেয়েও খারাপ ঘরে থাকে, খারাপ খায়—তা কী আমি জানিনা ? কে না জানে ? তবে হঠাৎ আমার দরদ উথলে ওঠার কারণটা কী ? গোটা পৃথিবীটা সম্পর্কে চিন্তা করার ভার তো আমার ওপরে কেউ দেয়নি ! এখন পৃথিবীতে মানুষ গিসগিস করছে—এর মধ্যে আমি কী করে কোনক্রমে একটু ভালো থাকব—সেটাই আমার চিন্তা করা উচিত। আর কোন ভাবালুতার কোন মানে হয়না।

ঠিক। সেকথাই আমি নিজেকে বোঝাই। অতীন আর সুমিত্রাকেও আমি সেই কথা বলি। অতীন আর সুমিত্রা এক অফিসেই চাকরি করে—খেয়ে-দেয়ে দুজনেই পান চিবুতে-চিবুতে এসে মোড় থেকে বাসে ওঠে। ওদের একটি দুবছরের বাচ্চা আছে—বাড়িতে আয়ার কাছে তাকে রেখে যায়। নিজের বাচ্চা আছে বলেই বোধহয় সুমিত্রা হঠাৎ খবু স্নেহপরায়ণ হয়ে যায়। রকটার দিকে তাকিয়ে বলে আহারে, বাচ্চাটাকে কীভাবে বেঁধে রেখেছে। ওর মার একটু দয়ামায়াও নেই !

আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। ক'দিন আগে আমারও এরকম মনে হয়েছিল। আজ সুমিত্রার মুখে একথা শুনে আমি রেগে উঠি। হয়তো একটা মেয়ের চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা মিলে গেছে—এটাও একটা রাগের কারণ। আমি ঝাঁঝালোভাবে বলি তাতে কী হয়েছে ? বেঁধে না-রাখলে তো গড়িয়ে পড়ে যেত।

আমার কথার ঝাঁঝে সুমিত্রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। তারপর মুচকি হেসে বলে, খুব স্মার্ট আপনি ? না। সত্যি !

অতীন আমার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। তারপর দেশোদ্ধারকারীর মতন কৃত্রিম মুখ করে বলে, আসল ব্যাপারটা কী জানিস। এই যে ছেলেটাকে এখন বেঁধে রাখছে—এর ফলে ভবিষ্যতে কী হবে? ও যখন বড় হবে—তখনো ওর বন্ধন কাটবে না। স্বাধীনভাবে কোন কাজে ও হাত দিতে পারবেনা, কোন নতুন জায়গায় যেতে সাহস পাবেনা—সব সময় মনে করবে ওর গলায় দড়ি বাঁধা। অবশ্য এই একটা-আধটা কেসের কথা ভেবে লাভ নেই—একটা বিপ্লব না এলে—

আমি বললুম, ওসব ছেঁদো কথা রেখে দে। তোর কাছে বিপ্লব মানে তো অফিসে গিয়ে কাজ না করে স্ট্রাইক বাধানো। এদিকে সকালবেলা টোস্টে মাখন কম হলে তো রোজ সুমিত্রাকে বকুনি দিয়ে—

সুমিত্রা আবার মুচকি হেসে বলে, যা বলেছেন!

অতীন আমার কাঁধে হাত রেখে বলে, কী ব্যাপার, আজ যে তুই সকাল থেকেই খাপচুরিয়াস?

আমি বললুম, বন্ধনের কথা বলছিস? ঐ ছেলেটার মধ্যে যদি সেরকম মালমশলা থাকে ও ঠিকই বন্ধন ছিঁড়তে পারবে। গোটা জাতটার কারুরই তো বন্ধন ছেঁড়ার আগ্রহ নেই দেখতে পাচ্ছি।

—দুশো বছরের পরাধীনতার জের চলছে। যাই বল এটুকু ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা আমি আগে কখনো দেখিনি।

—বরাবরই আমাদের দেশে এ জিনিশ চলছে। শ্রীকৃষ্ণকেও তো যশোদা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। কৃষ্ণ অবশ্য বন্ধন ছিঁড়েছিল। যমলার্জুনের কাহিনী পড়িসনি?

অতীন কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল। যার মানে হয়, যে-লোক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে সে-কেন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পড়ে সময় নষ্ট করতে যাবে! সুমিত্রা বলল, ঐ যে বাস এসেছে!

মনকে এসব বোঝানো সত্ত্বেও আমার ভুল হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পর আবার দেখলাম রকের ওপর সেই বাচ্চা ছেলেটাকে—বমি করে তার ওপরেই ঘুমিয়ে আছে। দেখে আমি নড়তে পারলামনা। কী করুণ সেই ঘুমন্ত ভঙ্গি, বিদেশি ফটোগ্রাফাররা এ দৃশ্য পেলে লুফে নিত। ঝিটা সেইসময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, নির্লিপ্তভাবে দড়ির গিঁট খুলতে লাগল। আমি তাকে না-বলে পারলামনা, তুমি কী গো! ছেলেটাকে এরকম একা-একা বেঁধে রেখে চলে যাও!

ঝিটা আমার দিকে একবার অবজ্ঞার চোখে তাকাল শুধু। কোন কথা বললনা। ছেলেটা ঘুম ভেঙে চোখ মেলল। অসুস্থ লাল চোখ দেখে আমি বললুম, ইস। ছেলেটা এবার আমাকে দেখল।

হঠাৎ তার সেই অসুস্থ লালচে চোখ আর তার মায়ের নির্লিপ্তভঙ্গি দেখে আমার অসম্ভব ভয় করল। আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। কিন্তু ভয় তক্ষুনি কাটলনা। সেই ভয় থেকেই দুঃস্বপ্নের জন্ম।

সে রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে আমি ঘামে ভিজে চিৎকার করে জেগে উঠলাম। স্বপ্ন দেখলাম, চারদিকে খুব গোলমাল হচ্ছে। হঠাৎ যেন অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে। হু-হু করছে বাতাস, দূরে মাঝে-মাঝে আগুনের হলকা দেখা যাচ্ছে। আমি পথ খুঁজে পাচ্ছিনা—ছুটোছুটি করছি এইসময় একটা বিশাল চেহারার মানুষ একটা লম্বা ছুরি নিয়ে আমার সামনে লাফিয়ে পড়ল। লোকটা ছুরি উঁচিয়ে বলল এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম! আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম, আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকেই।

লোকটার সবল পেশীবহুল শরীর। কালো কুচকুচে দেহ। প্রায় উলঙ্গ, শুধু একটা কাপড়ের টুকরো কোমরে বাঁধা। পেটের চারপাশে একটা গোল ঘা। লোকটার মুখ আমার একটু যেন চেনা মনে হচ্ছিল। চিনতে পারলাম, এ সেই ঝিয়ের ছেলেটা—এতবড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু পেটের কাছে সেই নারকোল দড়ি বাঁধার ঘা-টা রয়ে গেছে।

আমি কাতরভাবে বললুম, আমাকে মারবে কেন? আমি কী দোষ করেছি? লোকটা কর্কশ হুংকারে বলল, তুমি আমাকে একদিন দয়া দেখাতে এসেছিলে। যে-যে আমাকে দয়া দেখিয়েছিল আমি তাদেরই আগে খুন করব।

একথা বলেই সে ছুরিটা আমার বুক লক্ষ করে তুলে ধরল।

১০

মুনা আর বাবুই আমেরিকা যাচ্ছে, এয়ারপোর্টে বহু নারী-পুরুষ এসেছেন ওদের বিদায়ের হাতছানি দিতে।

ডাকনাম শুনলে বোঝা যায় না, আসলে ওরা দুজন আধুনিক যুবক-যুবতী। মেয়েটির বয়েস কুড়ি-একুশ, হালকা ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা মুখ জুড়ে আছে টলটলে দুটি চোখ—এখন সেই চোখদুটি একটু অস্থির, সিল্কের শাড়ির আঁচল সামলাতে-সামলাতে বারবার চঞ্চল পায়ে ঘুরছে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের এদিক থেকে ওদিক। ছেলেটিও বেশ রূপবান দীর্ঘ চেহারায় নিখুঁত পোশাক, কোট কাঁধের ওপর রাখা, মুখে একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের হাসি। মুনা—অর্থাৎ অনুরাধা, বাবুই অর্থাৎ

সিদ্ধার্থ, খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই 'উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা' উপলক্ষে যেসব ছেলেমেয়েদের ছবি বেরোয়, ওদের ছবি না-দেখলেও বুঝতে পারলাম —ওরাও সেই দলেরই।

আমার এক কাকার বম্বে থেকে আসার কথা, আমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম তাঁকে আনতে। আমাদের পরিবারে ঐ একটিই কাকা, যাঁর মাঝে-মাঝে প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য হয়, সুতরাং তাকে খাতির দেখাবার জন্য তাঁর আসার দিন কারুকে এয়ারপোর্টে যেতে হয়। বাড়ির মধ্যে আমি ছাড়া বেকার কেউ নেই—সুতরাং আমারই ওপর ভার পড়েছিল। গিয়ে শুনলাম, প্লেন আসবে তিনঘণ্টা পরে—এই দীর্ঘ সময় আমি কী করব, বেরিয়ে খানিকটা ঘুরেও আসতে পারতাম, কিন্তু আমি অপেক্ষাঘরেই গদিমোড়া আসনে বসে রইলাম পাখার নিচে। আমার হাতে একটা বই ছিল, কিন্তু বইতে মন দিতে পারলামনা—আমি এয়ারপোর্টের মানুষদেরই দেখতে লাগলাম, দেখতে আমার ভালো লাগল। এক সঙ্গে এত ভালো পোশাক পরা, সুন্দর চেহারার, আপাতসুখী মানুষ অন্য কোথাও দেখা যায়না। চারিদিকেই চকচকে রূপ, ঝকঝকে কথাবার্তা। আর কী সব চমকপ্রদ কথাবার্তা, রোম-প্যারিস-নিউইয়র্ক-লণ্ডন ইত্যাদি স্বপ্নের শহরের নাম কী অনায়াসে উচ্চারিত হয় মুখে-মুখে!

—লণ্ডনটা অতি বিশ্রী জায়গা—দুদিনের বেশি ওখানে থাকবনা ভাবছি!

—চৌধুরি, তুমি তো প্যারিসে থাকছ? সে হ্যালো টু ইফেল টাওয়ার ফর মি, উইল য়ু?

—গতবছর আমি যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে ছিলাম এইসময়, এমন বৃষ্টি!

—রোমে গেলে কিন্তু ভিয়া ভেনেতো যেতে ভুলো না!

—বার্লিনে পৌঁছেই কিন্তু মেজো বউদির সঙ্গে দেখা করবে?

—মুনা, নিউইয়র্ক নামার আগেই কিন্তু এক্স-রে প্লেটদুটো হাতে নিয়ে নিও। আমার বেলায় এমন গণ্ডগোল—

—খোকন, প্রত্যেক সপ্তাহে একটা চিঠি দেবে—

—শোনো, জেনিভার একটা হোটেলের ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি...

—এই নিয়ে আমি চারবার ইংলণ্ড যাচ্ছি, আর ভালো লাগেনা!

আমার হাতে একটা রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্পের বই, কিন্তু তবু সেটায় মন দিতে পারছিনা, আমি অবাক হয়ে এইসব কথাবার্তার টুকরো শুনছি উদগ্রীবভাবে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি সবার মুখে-মুখে—কী অবলীলাক্রমে ঐসব উপন্যাসে পড়া শহরের নাম উচ্চারিত হচ্ছে এখানে। একটা বুলডগ চেহারার সাহেবের পাশে একটি বিড়ালমুখী মেমসাহেব দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে নিন্দে করছে কলকাতার

পাঁউরুটির, জার্মান বউয়ের সঙ্গে এক ভেতো বাঙালি নাকিসুরে আদুরে গলায় রাজনীতি আলোচনা করছে, একটি গাউন-পরা গুজরাতি মেয়ে হেঁটে গেল শাকচুন্নীর মতো। একপাশে স্ট্রেচারের উপর শুয়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে, মেয়েটি সম্ভবত খুবই অসুস্থ, এই অবস্থাতেই প্লেনে যাবে, কিন্তু মেয়েটির মুখে অসহায়তার বদলে আছে অদ্ভুত অহংকারের ছাপ।

আমি এসবই দেখছিলাম, কিন্তু আমার মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করল আমার পাশেই দাঁড়ানো দলটি। মুনা আর বাবুই, আর ওদের বিদায় দিতে আসা আত্মীয়-পরিজন। আমি ওদের আগে কখনো দেখিনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই ওদের ডাকনাম, ভালোনাম জেনে গেছি। কান পেতে শুনছি ওদের কথা।

আমি একসময় দাবা খেলতে খুব ভালোবাসতাম। এখন আর খেলিনা, এখন অন্য একটা অভ্যেস এসে গেছে। এখন অপরিচিত লোকজন দেখলেই মনে-মনে খেলা করি, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক—এই নিয়ে। আমি বইয়ের আড়াল থেকে মাঝে-মাঝে চোরা চোখে তাকিয়ে—এই অনুমানের খেলা শুরু করে দিলাম। আজকের নায়ক-নায়িকা বাবুই আর মুনাকে আমি প্রথমেই চিনে গেছি—অন্য সকলের কথা শুনে। এখন সব কথাবার্তার কেন্দ্র ওরা। মেয়েটির মা কোথায় ? মেয়ের মায়ের চেহারা আজ কী রকম হওয়া উচিৎ ? করুণ, থমথমে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভরা মুখ ? না, সেরকম তো কারুকে দেখছিনা। স্পষ্ট বোঝা যায়, এ পরিবারে বিদেশ যাওয়া নতুন কিছু না। অনেকেই আগে ঘুরে এসেছেন। বিদেশ যাওয়াটা আমাদের একধরনের ছোঁয়াচে রোগ, এক পরিবারের একজনের পক্স হলে যেমন অন্য আর দু-একজনের না-হয়ে ছাড়ে না, বিদেশ যাওয়াটাও সেইরকম। এবং পক্সের মতোই বিদেশ ঘুরে আসার চিহ্নও অনেকের গায়ে-মুখে লেগে থাকে সারাজীবন। এই দলটি অবশ্য স্বাভাবিক, তবু বুঝতে পারলাম—কেউ-কেউ বিদেশফেরৎ।

যে-মহিলা হাসতে-হাসতে মেয়েটিকে বলছেন, ও কি মুনা, তুমি একটু হাসছ না কেন ? বাঃ !—সেই মহিলাই নিশ্চয়ই মেয়েটির মা। ঐ সুন্দরী মেয়েটির রূপের আভাস আছে ঐ মহিলার মুখে, এখন সে রূপ শান্ত। হ্যাঁ, ঐ মহিলাই নিশ্চয় মা। আমি বাজি রাখতে পারি। কারণ মহিলাটি যদিও হাসছেন খুব, মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই—মনে হচ্ছে মেয়ের বিদেশ যাবার জন্য সত্যিই খুশি—ওঁর মুখে একটা সূক্ষ্ম দুঃখের পর্দা আমার চোখ এড়াতে পারেনি।

এবার ছেলেটির মা ? ছেলেটির মাকে আমি ঠিক খুঁজে পেলাম না। মহিলাদের দিকেও বারবার তাকাতেও পারিনা। আরো পাঁচ-ছজন মহিলা ও যুবতী আছেন ! কিন্তু ছেলেটির বাবাকে আমি খুঁজে পেলাম। দীর্ঘ চেহারার প্রৌঢ়, মুখে সবসময় একটি কৌতুকের হাসি। বুঝতে পারলাম, ছেলেটি তাঁর ঐ কৌতুকের হাসি

উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। তাঁর পাশে আরেকজন সুঠাম চেহারার ভদ্রলোক নিশ্চিত মেয়ের বাবা। মুখের কোন মিল নেই, তবু আমার মনে হল। মেয়েটির বাবার মুখ একটু ক্লান্ত, একটু যেন চিন্তাক্লিষ্ট। সে চিন্তা মেয়ে চলে যাবার জন্যও হতে পারে—বা, যুদ্ধের সাম্প্রতিক খবরের জন্যও। কেননা, শুনলাম, তিনি একবার ভারী গলায় মেয়েটিকে বললেন, তোমার মুখ হাসিখুশি নয় কেন? নতুন দেশ দেখার একটা থ্রিল আছে, আমার এখনো মনে পড়ে—। একটু বাদে, পাশের একজনকে বললেন, ইন্দোনেশিয়া কী সত্যি পাকিস্তানকে সাহায্য করবে?

মুখে অল্প দাড়ি একটি সদ্য যুবক, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো চেহারা—এ খুব সম্ভবত মেয়েটির ভাই বা দেওর। যে-কোন একটা হতে পারে! সে বলল, তোমরা দু-বছর থেকে যাও, তারপর আমিও চলে আসছি! আমি গেলে আর ফিরবনা।

পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন যুবক-যুবতী, এরা কয়েকজন নিশ্চিত মেয়েটির বন্ধু, কয়েকজন ছেলেটির। এইসময় হন্তদন্ত হয়ে আরেকজন যুবক এল, শার্টপ্যান্টের সঙ্গে চটি পরা, একটু বেমানান, বোকা অথবা লাজুকের মতো মুখ। মেয়েটি বলল, আরেঃ, মাস্টারমশাই? এমন রেগে গিয়েছিলাম—একবারও খোঁজ নিলেননা!

—কী করব, আমি তো কালকেই খবর পেলাম!

—ইচ্ছে করেই খবর দিইনি! আপনি একবার—

মাস্টারমশাই নামের যুবকটি কী বলল যেন, বোঝা গেলনা। মেয়েটি আর-একটি কালো চশমা পরা মেয়েকে ডেকে বলল, ছোটোমাসি, দেখো মাস্টারমশাই এসেছেন শেষপর্যন্ত! মেয়েটির স্বামী এসে বললে, যাক, তবু আপনার সঙ্গে দেখা হল! ছেলেটির বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মাস্টারমশাই।

যুবকটি মৃদু স্বরে বলল, আমার নাম মাস্টারমশাই নয়, আমার নাম অমুক—।

হঠাৎ কেউ একজন এসে বলল, এবার যেতে হবে, নাম ডেকেছে!

—আমাদের ফ্লাইট তো, ঠিক?

—ক্যারাভেল দিয়েছে, না জেট?

—উঃ, বম্বেতে যে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

দলটা আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছে, প্লেন ছাড়ছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। গেটের মুখে-মুখে বালির বস্তা সাজানো। এসব বালির বস্তা দেখলে সত্যিই যুদ্ধের কথা ভেবে গা ছমছম করে! আমার কাকার প্লেন আসতে এখনো অনেক দেরি। এতক্ষণ ঐ দলটার কথা

শুনতে-শুনতে—যেন আমিও ওদের দলে মিশে গেছি। এত দূর বিদেশে চলে যাচ্ছে—এই দুই নবীন স্বামী-স্ত্রী, ওদের দুজনের জন্য আমারই মন কেমন করতে লাগল। আবার কতদিন পর দেখা হবে বাবা-মার সঙ্গে—ওদের বাবা-মায়ের কী বুক গুরু-গুরু করছে না? কিন্তু কোথাও তো আমি কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখছিনা যেন মনে হচ্ছে, বিয়ের পর ওরা দুজন দার্জিলিং যাচ্ছে মধুযামিনীতে—সবাই এমন আনন্দ করে বিদায় জানাচ্ছে—অথচ আমেরিকা, পৃথিবীর উল্টোপিঠে যাচ্ছে ওরা। শেষমুহূর্তে কেউ কী কাঁদবে না? কারুর চোখের জল পড়বে না? শেষপর্যন্তও সকলের এমন মনের জোর থাকবে?

হঠাৎ আমি উঠে পড়ে ঐ দলটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমার কী দরকার, আমি ওদের কারুকে চিনিনা, জীবনে আর কখনো দেখা হবে না, তবু আমার অসম্ভব কৌতূহল হতে লাগল শেষমুহূর্তে কারুর চোখের জল পড়ে কিনা দেখার জন্য। মানুষ কী আজকাল সত্যিই এমন আধুনিক হয়ে গেছে? জানি, বিমানযাত্রায় আজকাল কোন দুর্ভাবনা নেই, কিন্তু মেয়েরাও কী সেকথা মানবে? অকারণে, দুর্ভাবনা করাই যে মেয়েদের স্বভাব। আমিও ওদের দলের পিছনে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে সবার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কোথাও একফোঁটা চোখের জল দেখা যায় কি না।

গেট পেরিয়ে প্লেনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে ছেলেটি সবার সঙ্গে করমর্দন করল, পিতাকে আলিঙ্গন করে বেশ সপ্রতিভভাবে বেরিয়ে গেল, মুখে তখনো সেই কৌতুকের হাসি। মেয়েটি কারুর সঙ্গে একটিও কথা বললনা, সুন্দর টলটলে চোখ মেলে শুধু তাকাল সবার দিকে, বুঝতে পারলাম একটি কথা বলতে গেলেই কান্না বেরিয়ে আসবে। এরকম আধুনিকা মেয়ে, যাবার আগে কাঁদলে যে ওকে একদম মানাবেনা। ক্রমে ওরা প্লেনের মধ্যে উঠে গেল—কী জানি কোন জানালার পাশে বসেছে, ওদের আর দেখা যায়না। মেয়ের মা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্লেনের দিকে। বাবা তখন সেই মাস্টারমশাই নামের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করছেন, কী মনে হয়, চীন সত্যিই আবার আক্রমণ করবে?

কী কারণে প্লেন ছাড়তে দেরি করছে। বালির বস্তার পাশে দাঁড়ানো যায়না—এত ভীড়। অথচ প্লেন ছাড়বার আগে কেউ যাবেনা। এই দলের সকলে, হঠাৎ ওখান থেকে এসে বাইরের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালেন! ওখান থেকে প্লেনটা স্পষ্ট দেখা যায়। কী আশ্চর্য, আমিও ওদের সঙ্গে চলে এসেছি, তাকিয়ে আছি প্লেনের দিকে। কী ভাগ্যিস আমাকে কেউ এসে জিজ্ঞেস করবেনা, আপনার তো কোন চেনা লোক নেই এ প্লেনে—তবু আপনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে। আমি কেন দাঁড়িয়ে? আমি কোথাও এক ফোঁটা চোখের জল দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

আমি সঙ্কোচ ভুলে, সমবেত মেয়েদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। দু-একজনের চোখ যেন চিকচিক করছে, আভাস এসে গেছে, এখন প্লেন ছাড়ার শুধু অপেক্ষা। এই সুন্দরী, সপ্রতিভা মহিলাদের চোখের জল আমি দেখে যাব।

দেখা হলনা। ঝুপঝুপ করে হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। আমি সমেত দলের সকলকেই ভিজিয়ে দিল বৃষ্টি। এখন আর চোখের জল বোঝা যাবেনা।

১১

শুনেছিলাম তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছেই কোথাও থাকেন। ঠিক বাড়ির নম্বরটা জানিনা, বাড়ি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বছর তিনেক আগে এক দুপুরবেলা আমি ট্রাম থেকে ঠনঠনের সামনে নেমে পড়েছিলাম। একটু ভয়-ভয় করছিল, কী জানি কেমন লোক, আমি বিরক্ত করতে এসেছি বলে যদি ধমকে ওঠেন। যাইহোক আজ দেখা না-করে আর ফিরছিনা।

কালীবাড়ির রকে একজন লোক বসে আছে, এমন চেহারা যে বয়স বোঝার কোন উপায় নেই। লোকটির মুখে কাচা-পাকা মুড়ি-মিছরি ধরনের দাড়ি কিন্তু মাথার চুল কুচকুচে কালো। আমি একটুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ পাড়ায় শিবরাম চক্রবর্তী কোথায় থাকেন বলতে পারেন ?

লোকটি প্রথমেই আমার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করল। হয়তো আমার লেখা উচিত ছিল, 'করলেন' কিন্তু লোকটির ব্যবহার এমন যাচ্ছেতাই যে এসব লোককে কিছুতেই আপনি বলা যায়না। ওরকম কুটিলভাবে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখার দরকারটা কী ? লোকটির গলার আওয়াজ কাক ডাকার মতন, জিজ্ঞেস করল, কে থাকে ? কী নাম ?

আমি সম্ভ্রমপূর্ণ গলায় পুনরায় বললুম, আজ্ঞে, শিবরাম চক্রবর্তী। দয়া করে যদি—

দয়া করে যদি—

—বাড়ির নম্বর কত ?

—আজ্ঞে বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানিনা সেইজন্যই তো—

—বাড়ির ঠিকানাটা জানো না, কলকাতা শহরে লোক খুঁজতে এসেছ ? কে পাঠিয়েছে তোমায় ?

—কেউ না, উনি বিখ্যাত লোক, তাই আমি ভেবেছিলাম—

লোকটি হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিখ্যাত লোক এ পাড়ায়?

তারপর সে ঠোঁটদুটি পুরো ফাঁক করল। অর্থাৎ হাসি। বলল, এ পাড়ায় বিখ্যাত লোক দুজনই আছে, আমি আর কাশীরাম ভট্টাচার্যি। আমায় তো চেনোই দেখছি, কাশীরাম ভট্টচার্যির নাম শুনেছ? প্রখ্যাত জ্যোতিষী সম্পর্কে আমার আপন ভগ্নিপোত, তুমি বোধহয় তাকেই—

আমি বললুম, আমি নাম শুনিনি বটে, কিন্তু উনি নিশ্চয়ই খুব বিখ্যাত। তবে আমি খুঁজছি শিবরাম চক্রবর্তীকে।

—তবে যে বললে বিখ্যাত লোককে খুঁজছ? সে লোকটা কিসে বিখ্যাত?

—উনি একজন লেখক। আমাদের শ্রদ্ধেয়—

—লেখক! কী লেখে?

প্রধানত হাসির গল্পই লেখেন। তাছাড়া আগে—

—হাসির গল্প? চালাকি পেয়েছ?

লোকটি এবার বেশ ক্রুদ্ধ। সোজা হয়ে বসে বলল, হাসির গল্প আবার লেখার কী আছে হে! ওসব মানুষে লেখে? লেখে লোকে ধম্মোকম্ম, সদা সত্য কথা, কী করে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হয়—এইসব নিয়ে। তুমি এসেছ হাসির গপ্পো চালাতে? আমার সঙ্গে ফাজলামি-এয়ার্কি?

ইতিমধ্যে তিন-চারজন কৌতূহলী লোক জমে গেছে! একজন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? পকেটমার না জুতোচোর? আজকাল কালীবাড়িতে এমন জুতোচোরের উপদ্রব হয়েছে। আরেকজন বলল, পকেটমার না তো?

মূল লোকটি খেঁকিয়ে উঠে বলল, ছোকরাকে দেখছি তখন থেকে এখানে ঘুরঘুর করছে। বাবুরাম চক্কোবর্তী না কাকে খোঁজার ছুতো।

আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, বাবুরাম না শিবরাম।

—ও নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে? আপনারাই বলুন! আমি তিরিশ বচ্ছর এ পাড়ায় আছি, আমি জানিনা!

জনতা বলল, ঐ তো কাশীরামবাবু আসছেন, ওকেই জিজ্ঞেস করুননা!

বেশ টের পেলাম, লোকে আমায় ঘিরে ধরেছে! দৌড়ে পালাতে গেলে হিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনা। কাশীরামবাবুর চেহারা রোগা-চিমশে ধরনের, কপালে ফোটা-তিলক। দেখে আরো ভয় হল। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খুব বেশি রোগা লোকেরা কিছুতেই সরল কথা বোঝেনা। সবসময়েই তাদের জেরা করার টেণ্ডেন্সি। ইনিও এসে শুনে সাহাস্যে বললেন, আগে বলো তো বাপু, এ পাড়ার সেই লোকটির সঙ্গে তোমার কী দরকার?

সর্বনাশ, একথা আগে তো একবারও ভাবিনি। দরকার তো কিছু নেই? আমি আমতা-আমতা করে বললুম, না, মানে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে—

জনতা গর্জন করে উঠল, অ্যাঁ, দেখতে? শুধু দেখতে? একজন জলজ্যান্ত মানুষকে শুধু চোখের দেখা দেখতে? স্পাই! স্পাই!

কাশীরামবাবুই দয়ালুভাবে বললেন, আহা-হা, আগেই মারধোর শুরু কোরো না! আগে দেখা যাক, সত্যিই ও নামের কোন লোক এ পাড়ায় থাকে কি না! যদি এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যেও কোথাও সে থাকে, আমি গুণে বলে দেব!

ফতুয়ার পকেট থেকে খড়ি বার করে তিনি মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলেন। গোটাকয়েক চৌখুপ্পি আর ঢ্যাড়া। চক্রবর্তী তাহলে তোমার হল গিয়ে অমুখ গোত্র, নামের প্রথমে যদি তালব্য শ থাকে—। আমি তখন দরজা-জানালা-বন্ধ-ঘরের মধ্যে বেড়ালের মতন আটকে পড়েছি। ভাবছি এবার আঁচড়ানো-কামড়ানো শুরু করব কি না। নাকি কেঁদে-কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দেব!

খানিক বাদে চোখ খুলে কাশীরাম জ্যোতিষার্ণব বললেন, তেমনি হাসি-হাসি মুখ, নাঃ ও নামে কোন লোক থাকতে পারেনা। সর্বৈব বাজে কথা। এ পাড়ায় কেন, কোথাও নেই!

আমি বললুম তাহলে মন্টুর মাস্টার কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে—এগুলো কে লিখেছে? নাকি আপনি বলতে চান, এরকম কোন বইও নেই?

এমন সময় একটি শৌখিন চেহারার যুবা, ফর্শা, সুদর্শন, একমাথা কোকড়ানো চুল, ধপধপে আদ্দির পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম—ভিড়ের মধ্য থেকে এসে আলতোভাবে আমার কাঁধ ছুয়ে বলল আহা, ওকে ছেড়ে দিন। ও আমাকে খুঁজছে!

আমার চেয়েও কাশীরামের বিস্ময় বেশি। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, আপনিই? তা চক্রবর্তী আপনার উপাধি না খেতাব? রাঢ়ী না বারেন্দ্র? খড়দা মেল না ফুলেল মেল? ওঃ! তাই বলুন, এইজন্য আমার গণনা একটুর জন্যে মেলেনি!

বলেই কাশীরাম ভিড়ের মধ্যে সুট করে মিশে গেলেন। যুবকটি আমার হাত ধরে ফাঁকায় নিয়ে এসে সস্নেহে বললেন, এবার বলো!—আমার বুকের ধড়ফড় তখনো কমেনি। ঢোঁক গিলে বললাম, আপনার এত বয়স কম? আমি ভেবেছিলাম একেবারে অন্যরকম।

যুবকটি বললেন,

অন্যরকম অন্যবেশি

বুঝলে বেশির কম, কমবয়সী ?

অথবা বলতে পারো, বয়সের ভয়েস কখনো বেশি Boyish কখনো বায়সের মতন Raw. কখনো ভঁইসের মতন...

আমি বললুম, সত্যিই যদি আপনার কম বয়েস হয়, তবে আমাকে 'তুমি বলবেন না। আমিও রোজ-রোজ দাড়ি কামাই।

—রোজ রেজারে দাড়ি কামাও, না দাড়ি কামিয়ে রোজের রুজি রোজগার করো, তোমার চেহারাখানা তো দেখলে মনে হয়, চেয়ারহারা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দাড়ি কামানোই...

একটু আস্তে-আস্তে বললুম, না, আমি লিখে নিই। অত তাড়াতাড়ি বলছেন একটু মাঝে-মাঝে দাড়ি-কমাও না বসালে—

—বেশ-বেশ শিখে গেছো দেখছি। তোমারও হবে। চালিয়ে যাও। পেছন থেকে রুক্ষ গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, এই পল্টু ! পল্টু ! একঝলক তাকিয়ে দেখি একজন বেঁটে-কালো-গুণ্ডা চেহারার লোক আমাদেরই দিকে তাকিয়ে ডাকছেন। যুবক শিবরাম চক্রবর্তীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার নাম যে পল্টু নয়, সে ই অন্তত আমি ভালোরকমই জানি। আবার পল্টু, পল্টু ডাক শুনে আমি ওঁকে বললুম, আপনাকে ডাকছেন বোধহয়। আপনার ডাকনাম পল্টু বুঝি ?

হ্যাঁ।

—তাহলে আপনি শিবরাম নন শিবরামের ডাকনাম কখনো পল্টু হতে পারেনা !

পিছন থেকে সেই লোকটি এসে বলল, ও বুঝি তোমায় বলেছে, ও শিবরাম। ব্যাটা মহাজোচ্চোর ! শিবরাম হচ্ছি আসলে আমি, আমার নাম শিবরাম সেন— একথা বলেই লোকটার কী হাসি।

আমি বললুম, কিন্তু আমি তো শিবরাম চক্রবর্তীকে খুঁজছি। সেন তো না !

ঐ হোল। আমিই আস্তে-আস্তে চক্রবর্তী হয়ে উঠব। শুনবে ? আমি মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ির তক্তায় শুয়ে শুক্তো খাই। স্ত্রীকে দিয়ে জামাটা ইস্তিরি করিয়ে নিয়ে মিস্তিরি খুঁজতে যাচ্ছিলুম এমন সময় চটির সঙ্গে চটাচটি হয়ে—

প্রাগুক্ত যুবক বললেন, ধুৎ ! বাজে ! সব মুখস্ত। কেন ছেলেটাকে শুধু-শুধু ঠকাচ্ছ ? আমার মতন বানান নিয়ে বানানোর ক্ষমতা আছে তোমার ? এসো না কমপিটিশন হয়ে যাক !

—কমপিটিশনে কে জজ হবে ?

—কেন, এই ছেলেটি !

—উঃ, যদি কারুকে কম পিটি কারুকে বেশি পিটি করে ?

আচ্ছা, ঐ তো বড়দা আসছেন, বড়দাকে জাজ কবা যাক।

একজন সৌম্য চেহারার, প্রৌঢ় আসছিলেন। বিশাল দেহ, মাথাভর্তি চকচকে টাক, সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি। মনে হয় কোন রিটায়ার করা জমিদার বিকেলের ভ্রমণে বেরিয়েছেন। লোকদুটো ওঁর কাছে গিয়ে বললে, বড়দা, আপনি বিচার করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কে সত্যিকারের শিবরাম?

প্রশান্ত হাস্যে সেই প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে খুশি হলাম। পাঠকদের দেখা পাওয়াই তো আমাদের সৌভাগ্য। এই দুটোর কোন কথায় কান দিওনা। ওরা হচ্ছে রামশিব, আমিই হচ্ছি আসল শিবরাম। শিবরামের Soul! আর কারুর কথায় বিশ্বাস কোরো না, আমার কোন ব্রাঞ্চঅফিস নেই!

লোকদুটো বলল, বড়দা, এ কী হচ্ছে? এ আপনার অন্যায়!

রহস্যময়ভাবে প্রৌঢ় বললেন, আমিই যে আসল শিবরাম, তোরা এতদিন জানতে পেরেছিলি? অবশ্য, এখন আমি প্রমাণ দিতে গেলে তোদের কাছে হেরেও যেতে পারি। জানিস তো, বার্নার্ড শ-এর মতো গদ্য কে লিখতে পারে, এই নিয়ে একবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। স্বয়ং বার্নার্ড শ-ও তাতে ছদ্মনামে লেখা পাঠিয়ে পেয়েছিলেন মোটে তৃতীয় পুরস্কার। তেমনি তোদের কাছে আমি হেরে গেলেও—

যুবাটি বলল, আপনার চালের ব্যবসা, আপনি লাকি ম্যান তা বলে চালাকি করছেন এখানে? আপনি যদি শিবরাম চক্রবর্তী হন তো, আপনার চুল কোথায়? শৈল চক্রবর্তীর সব ছবিতে আছে, কপালের পাশে একগোছা চুল এসে পড়েছে, এই দেখুন না, আমার মতন—

প্রৌঢ় হঠাৎ চুপসে গিয়ে বললেন, ওসব আগেকার ছবি। আগে যখন আমার চুল ছিল—

—বাজে কথা। কুড়ি বছর ধরে আপনাকে দেখছি এইরকম গোল আলুর মতন মাথা, জম্মো থেকে আপনার টাকালু!

এরপর সেই তিনজন লোক শিবরামত্ব নিয়ে মহা ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর দৌড়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লাম।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তারপরও আমার কোনদিন দেখা হয়নি। দেখা হবেওনা জানি। আমার ধারণা শিবরাম চক্রবর্তী নামে বোধহয় কোন লোক নেই। শিবরাম চক্রবর্তী আসলে অনেকগুলো লোক।

১২

মানুষের মধ্যে আমি মাংসাশী শ্রেণীভুক্ত। চোয়ালের দু' ধারের দিকে যে চ্যাপ্টা, চেরা জোরালো দাঁতগুলি থাকে—আমার সেগুলি অটুট। এবং বারট্রাণ্ড রাসেলের মতে মানুষের এই মাংস-ছেঁড়া কুকুরদাঁতগুলি ক্রমশই নাকি শক্ত ও দীর্ঘ হয়ে উঠছে।

যখনই কলকাতা ছেড়ে তিন-চারজনে মিলে বেড়াতে যাই, স্টেশনে নেমে মালপত্র রাখতে-না-রাখতে খোঁজ শুরু হয়ে যায়, এখানে মুরগি পাওয়া যায় তো? দামে সস্তা তো? বাড়িঘর তুচ্ছ, আকাশে মেঘ জমেছে না ফটফট করছে নীল রং কোন বিখ্যাত ঝর্না আছে না দেবমন্দির—এসবকিছুতেই কিছু যায়-আসেনা, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মুরগি আছে তো? মুরগি? আমার এক সমুদ্র-পাগল বন্ধু কোনদিন আর দীঘায় যাবেননা বলেছেন, কারণ সেখানে মুরগি পাওয়া যায়না। বিশাল সমুদ্রও মুরগির তুলনায় কিচ্ছু না! বরং তিনি খানাডোবার পাশে বসেও মুরগি পেয়েও তৃপ্ত। চম্পাহাটিতে আমাদের এক বন্ধু বাড়ি তৈরি করেছেন, একদিন আমাদের বললেন, চল না আমার নতুন বাড়িতে একদিন বেড়িয়ে আসবি, সারাদিন, থাকবি, বেশ চমৎকার—। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সমস্বরে প্রশ্ন, মুরগি পাওয়া যায় তো?

কলকাতা শহরে থেকে যে-যুবা কোনদিন বাজার করতে যায়নি সেও রাঁচী-দেওঘর-মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে প্রত্যেক সকালে বাজারে ছুটে যায়। বাজারের বাহিরের দিকে বসা সারি-সারি মুরগিওলা, সাদা-কালো-হলুদছিটে জ্যান্ত পাখিগুলো পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মুখ থুবড়ে, ডানা ধরে হিঁচড়ে এক-একটাকে তুলে মনে-মনে ওজনটা বুঝে নেবার চেষ্টা, পেটের দিকের ছোট পালকগুলো ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দেখে নেওয়া যে চর্বি ঠিক মতো আছে কিনা। তারপর দরদাম, কথা বলার সময় হাতের দামি সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা, কিন্তু সামান্য চারআনা দাম কমাতে পারলেও অভূতপূর্ব আনন্দ!

বছর সাতেক আগে, আমরা চারজন মধুপুর স্টেশনে পা দিয়েছি সকাল এগারোটা আন্দাজ। সারা ট্রেনে হৈ-হল্লা করতে-করতে এসেছি, মাথার ওপর গনগন করছে রোদ, খিদে পেয়েছে সমান পাল্লায়। এক বন্ধুর বাড়ি ছিল মধুপুরে, সেই বাড়ির মালি এসেছে স্টেশনে, প্রথমেই খবর দিল যে আমাদের জন্য রান্না তৈরি। ছুটোছুটি করে স্নান সেরে আমরা খাবার টেবিলে বসেছি তরকারিফরকারি কীসব ছিল—কিন্তু কে সেকথা মনে রাখে? এছাড়া ছিল উত্তম বড় জাতের চিংড়ি ও কনুই-ডোবা বড়-বড় জামবাটিতে উত্তম খাসির মাংস। সে তো খাওয়া নয়

—যেন ব্যালে নাচ, চারজনের হাত সমান-সমান তালে উঠছে-নামছে, কড়মড় শব্দ, তাল রাখার জন্য মাঝে-মাঝে অট্টহাস্য। তখনো খাওয়া শেষ হয়নি, এমন সময় বাগানের গেট ঠেলে দুজন সাঁওতাল স্ত্রীলোক। ওবা খবব পেয়েছে যে, এ বাড়িতে বাবুবা এসেছে, বাবুদের কাছে ওরা মুবগি বিক্রি করতে এসেছে।

মুরগি ! মুবগি ! এঁটো হাতে আমরা ছুটে এলাম বাইরে—টেবিলে খাসিব মাংস ফেলে রেখে। কই দেখাও মুরগি, ক'টা আছে, দাম কত ? গুটিকতক দেশি মুবগি, বোগা, করুণ, জলে-ডোবা মানুষের মতো চোখ। পায়ে দড়ি বেধে সাঁওতাল মেয়েদুটি ওদের কাধে ঝুলিয়ে এনেছে, এবাব মাটিতে নামিয়ে বাখল। সবশুদ্ধ পাঁচটা, তার মধ্যে চাবটেই সমান ছোট—প্রায হাতেব মুঠোর সাইজ; আব একটা একটু বড়ো তেজি, অহংকারী ঘাড়। এক বন্ধু বললেন, এঃ ! এত ছোট-ছোট —এগুলো কী খাব—এ তো এক-এক গ্রাসে ! অপববন্ধু মুখ ফিরিয়ে বললেন ইংবাজিতে (যাতে বিক্রেতারা না-বুঝতে পারে) না, না, এই দেশি মুরগিরই স্বাদ ভালো—লেগহর্ন, রোড আয়ল্যাণ্ডেব চেয়ে এগুলো অনেক বেশি টেস্টফুল। সাওতাল মেয়েদুটো কী বুঝল কে জানে, সারা শবীবময হাসি জাগিয়ে পিজিন বাংলায যা বলল, তার ভাবার্থ, এই কুঁকড়োগুলো দেখতে ছোট হলেও ওজনে ভাবী। দেখতে খাবাপ কিন্তু কাজে ঠিক !— এত বলে হাত দিয়ে ঠোনা মাবল সেই পিট-পিট করে চেয়ে-থাকা কৃষ্ণের জীবগুলিকে। সেগুলো কক-ক-কক করে উঠল। আমাদেব এক বন্ধু সেদিকে তাকিয়ে মুখে ঝোল টানাব মতো শব্দে বললেন, আঃ ! এগুলোকে আজবাত্রে আমি নিজেব হাতে বোস্ট কবব। দেখবি, আমাব রান্না একবাব খেলে জীবনে আব ভুলতে পাববিনা।

তখনো আমাদেব এঁটো হাত, এবেলার খাওয়া শেষ হযনি। আমরা সাঁওতাল মেয়েদুটিকে অবলীলাক্রমে ঠকিযে চমকপ্রদ সস্তায মুরগিগুলো কিনে কয়লা বাখার ঘরে বেখে দিলাম। তারপর খাওয়া শেষ কবে ডুবে গেলাম তাস খেলায।

সূর্য ডুবে যাবার পবও আকাশে আলো ছিল, বাগানে চেযার পেতে আমরা বসে চা খাচ্ছি। মধুপুব জাযগাটাব একটা সবচেযে বড গুণ এই যে—কোন দর্শনীয় স্থান নেই সেখানে। কোন প্রাচীন মন্দিব কিংবা ছোট পাহাড় নেই কাছাকাছি—তাহলে আমবা সেগুলো দেখতে যেতে বাধ্য হতাম। কোথাও বেড়াতে গেলে এইসব দেখতে যাওয়াই নিয়ম, না-যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ অস্বস্তি থাকে—একমাত্র মধুপুরেই শুধু বাগানে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলে কোন আত্মগ্লানি আসেনা। একমাত্র অসুবিধে, ওখানকার আকাশটা বড্ড বড়, বিকটরকমের বিশাল—তার নিচে খুব ছোট হয়ে বসে থাকতে হয়।

অন্ধকাব নামতেই, আমাদের রন্ধনবিদ বন্ধু বললেন, এবার মুরগিগুলো কাটা যাক। ছুরি নিয়ে আয়।

আমি বাড়ি থেকে দুটো বড়ো চকচকে ছুরি নিয়ে এলাম। একটা তাকে দিয়ে আর-একটা নিজের হাতে। কয়লাঘর থেকে মুরগীগুলো বার করে ঝুলিয়ে এনে ছুঁড়ে দিলাম মাটিতে! তারপর একটার পায়ের দড়ি কেটে দিলাম। বন্ধু বললেন, সাবধান, দেখিস পালায় না যেন। আমি বললুম, না, না, তোকে অত সর্দারি করতে হবেনা! কিন্তু যা ভুল করার আমি করে ফেলেছি। বন্ধু চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, এই নীলে, তুই কীরকম উল্লুকের মতো কাজ করলি দেখ তো? আমি বুঝতেই পারিনি, একটা দড়ি দিয়েই পাকিয়ে-পাকিয়ে সবগুলোকে বাঁধা ছিল, দড়ি কাটতেই সবগুলো একসঙ্গে ছাড়া পেয়েছে। তিনটেকে তক্ষুনি খপখপ করে ধরে ফেলা হল, বাকি দুটো একটু দূরে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। অবিকল মেয়েদের চুল ঝাপটা দেওয়ার ভঙ্গি ওদেরও। লঘু পায়ে তির-তির করে ঘুরতে লাগল সেই বড়টা আর সবচেয়ে ছোটটা। আমরা গুটি মেরে এগিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করতেই কককক করে উড়ে একটু দূরে চলে গেল। আমাদের দলপতি বললেন, দাঁড়া পালাবি কোথায়, এক্ষুণি তোদের জান নিয়ে নেব। এই, বাগানের গেট বন্ধ কর, টর্চ নিয়ে আয়!

তারপর শুরু হল আমাদের অভিযান। বুক সমান উঁচু দেয়ালঘেরা বাগান তার মধ্যে আমরা চারজন যুবা, হাতে টর্চ ও ছুরি, যেন একটি দস্যুদল—তাড়া করতে লাগলাম সেই দুটো মুরগিকে। মুখে আমাদের হা-হা চিৎকার, টর্চের আলোয় ঝলসে উঠছে ছুরি, আমাদের ছুটোছুটি সারা বাগান জুড়ে, কিছুতেই ওদের ধরতে পারিনা। চারজনে চারদিকে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে ওরা দুজন নিরস্ত্র, আমরা আস্তে-আস্তে গোল করে ওদের দিকে এগিয়ে যাই, সাবধানে, আমাদের হাতের মুঠো খোলা, ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে ওরা পরস্পর চোখের ইশারা করে নিয়ে উড়াল দেয়, আমাদের মাথা ছাড়িয়ে চলে যায় অন্যদিকে। ওরা দুজনে ছিটকে যায় দুদিকে, আবার ওরা কাছাকাছি চলে আসে, হিলতোলা জুতো পায়ে হাঁটার ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক যায়, অন্যপাশে বাঁধা বাকি তিনটে মুরগি চিৎকার করে বোধহয় ওদের সাবধান করে দেয়।

আধঘন্টা ছুটেও ধরতে পারিনা, আমাদের তখন রক্তচক্ষু মাথায় খুন চেপে গেছে। একবার ছোট মুরগিটা একটু কাছাকাছি আসতে একজন সারা শরীর নিয়ে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। মুরগিটা ওর দেহের ভারে চেপটে গিয়ে মারা পড়লো তখুনি। আমরা উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। বড়টা তখনো অকুতোভয়, ঘাড় উঁচিয়ে আমাদের খেলাতে লাগল। সে একবার সটান উড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে, যেন চোখ খুবলে নেবে—কিন্তু মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমাদের দলপতির মুখ তখন ভয়ংকর হিংস্র, মুরগিটার দিকে দশ গজ দূরে

দাঁড়িয়ে ছুরি তুলে কর্কশ স্বরে বলল, আজ তোরই একদিন কী আমারই একদিন! তারপর ছুরিটা টিপ করে ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। সোজা লাগল গিয়ে সেই উঁচু-করা গলায়, মুরগিটা মাত্র দু-তিনবার ছটফট করেছিল। আমাদের বিজয় সম্পূর্ণ হল।

সেই রাত্রে একবন্ধু খাবার সময় বমি করে ফেলে। তারপর থেকে সে আর মাংস খায়না। আমি অবশ্য মাংস ছাড়িনি, মাংস আমার প্রিয় খাদ্য, মুরগি তার মধ্যে পরম প্রিয়। কারণ, এই মাংস আমার ভালো লাগে—আর যা ভালো লাগে, তা পাবার জন্য এরকম ছোটখাটো চক্ষুলজ্জা থাকলে চলেনা।

খেতে ভালো লাগে, এইটাই আমার নিজস্ব যুক্তি। এছাড়া, সভ্যতা আমাকে আরো যুক্তি শিখিয়েছে। প্রোটিন! মুরগির মাংসে যে প্রোটিন আছে, তা আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি! এমন অনেক রুগী আছে, মুরগির জুস খাওয়াতে না-পারলে তাদের বাঁচানোই নাকি মুস্কিল। একটা কথা আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, মুরগিদেরও তো খুব অসুখ করে! মানবশিশুর পক্ষে গরম দুধ না হলে চলেই না, অথচ গরুর বাচ্চারা দুধ না-খেয়ে কী করে বেঁচে থাকে, কে জানে! আমাদের যুক্তি আছে, পশুদের যুক্তি নেই!

১৩

আমি এখন জীবনের সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে জন্ম এবং মৃত্যু সমান দূর বলে মনে হয়। অথবা মৃত্যুকে মনে হয় খুবই কাছে, মৃত্যু তো জন্মের পর থেকেই খুব বিশ্বস্তভাবে কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। যাই হোক, এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমি একটি সমস্যায় খুবই পীড়িত বোধ করি, একটি ছেলে কোনদিন থেকে হঠাৎ একজন লোক হয়ে যায়? চঞ্চল লঘুমতি ছেলেটিকে কবে থেকে পৃথিবী বলবে, ঐ লোকটা—

এই প্রথম শীতের মেদুর অপরাহ্নে যখন পথ দিয়ে একা হেঁটে যাই, মন অস্থির হয় নানাকারণে। কোনদিকে যাব, মনে পড়েনা। আমি কোন জায়গা থেকে আসছি, না কোন জায়গায় যাচ্ছি, বুঝতে পারিনা। অর্থাৎ পিছন থেকে কোন মানুষ আমাকে এইমুহূর্তে দেখলে বলবেন, আপনি ঐদিকে যাচ্ছিলেন দেখলাম। আবার সামনে থেকে কেউ এই একই মুহূর্তে আমাকে দেখে বলবেন, আপনি এইদিকেই তো আসছিলেন...। জীবন এখন এইরকম।

এই ভারী সন্ধেবেলা একা হাঁটতে-হাঁটতে আমি অলস নয়নে পৃথিবীর

আটদিকে তাকিয়ে দেখি। যদি কোন চেনামুখ চোখে পড়ে। না, কারুকে দেখিনা, এইসময় কেউ তো একা থাকেনা, যে অপর একটি একলা মানুষকে চিনতে পারবে! কারুকে না পেয়ে, আমি নিজের সঙ্গেই দেখা করার চেষ্টা করি। কিন্তু নিজের সঙ্গে দেখা করা খুব কঠিন, অধিকাংশ সময়েই শুনতে হয়, উনি বাড়িতে নেই, বেরিয়ে গেছেন। কিংবা রূঢ়ভাবে, এখন খুব ব্যস্ত, দেখা হবেনা। বস্তুত, নিজেকে আমি কোনদিনই দেখিনি, কোনদিনই নিজের নাম ধরে ডাকিনি। আমি কী করে জানব, আমি ক্রমশ ছেলে থেকে লোক হয়ে যাচ্ছি কি না! ভবিষ্যৎ তো জানিনা, নিজের কথা ভাবলেই মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা,—তেঁতুলের আচার, ঘুড়ি-মাঞ্জা, শিবরাম-হেমেন্দ্রকুমারঘটিত উত্তেজনা, একমাইল পথ বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কোন এক কিশোরী মেয়ের সামনে দুরু-দুরু বুকে দাঁড়ানো, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে একটি চশমা-পরা যুবতীকে কিছুই বলতে না-পারার লজ্জা। আর কিছুই মনে পড়েনা। এসব কী কোন ছেলেমানুষী কাজ, না, কোন লোকের উচিত ব্যবহার, বুঝিনা। পথের লোক আমাকে দেখে কী বলছে, ঐ ছেলেটা, না, ঐ লোকটা? ও আসছে, না, ও যাচ্ছে?

লোক হবার কী কী চিহ্ন আমি খোঁজার চেষ্টা করি। বয়েসের কথা ভেবে কোন সুবিধে হবেনা, কারণ আমি আমার ছোটভাইয়ের চেয়ে বয়েসে বড়, কিন্তু আমার দাদার চেয়ে নিশ্চয়ই বয়েসে ছোট। আমার জুলপিতে দু'-তিনটে পাকা চুল। এই কী লোক হবার চিহ্ন? কিন্তু অমুকবাবু আমার চেয়ে অন্তত আঠারো বছরের জ্যেষ্ঠ, কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিটি কেশ-রোম ভ্রমরকৃষ্ণ। একটিও আধ-সাদা পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু অমুকবাবু যদি লোক না হন, তবে পৃথিবীটাই ছেলেমানুষীতে ভরা বলতে হবে। অপরপক্ষে, আমার সেজো পিসিমার ছোট ছেলে (সংক্ষেপে, আমার পিসতুতো ভাই বলাই উচিত ছিল বোধহয়)—যার বয়েস আমার চেয়ে অন্তত দেড়যুগ কম, তার মাথার অধিকাংশ চুলই পাকা—লিভার না কিডনি না হৃদয়ঘটিত কী দোষে যেন, সেও নিশ্চয়ই এই পক্ককেশ গুণে লোক হয়ে ওঠেনি। ক্রিকেটের বল লোফালুফি করতে করতে সে এখনো পিসেমশাইয়ের ভাতের থালায় ফেলে দিয়ে খাওয়া নষ্ট করে—এটাকে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকোচিত কাজ বলা যায়না।

তুমি-আপনি সম্বোধন থেকেও কিছুই বোঝা যায়না। যেমন কোন অপরিচিত ভদ্রলোক যদি প্রথম আলাপেই আমাকে তুমি বলে কথা বলেন, আমি বিরক্ত হয়ে উঠি,—আবার, কোন অচেনা ছেলে বা মেয়ে যদি প্রথমেই এসে আমাকে অমুকদা বলে ডাকে, তাহলেও রাগে আমার গা জ্বলে যায়। এও সেই, যাচ্ছি না আসছি—সেই সমস্যা! মেয়েরাও ঠিক কবে থেকে একটি মেয়ে থেকে হঠাৎ মহিলা

হয়ে ওঠেন, তাও বোধহয় একটা সমস্যা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার দিনই কী সেই সীমান্ত? কিন্তু, এ সম্পর্কে আমার কিছু জানার কথা নয়!

তবে কী অভিজ্ঞতাই একটি ছেলেকে লোক করে তোলে? জীবনের কোন-কোন ঘটনাকে ঠিক অভিজ্ঞতা বলে আমি বুঝতে পারিনা। জীবনে যা কিছু ঘটে সবই কী অভিজ্ঞতা, নাকি কোন-কোন বিশেষ ঘটনা? আমি বেছে নিতে পারিনা। এক হিসেবে জীবনের সব ঘটনাই মূল্যবান, আবার সব ঘটনাই অর্থহীন। জীবনের কোন-কোন ঘটনাকে অভিজ্ঞতা বলে, তা-ই যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে আর জীবন এত দুর্বোধ্য কেন?

নিজেকে দেখতে পাইনা, তাহলে ছেলেবেলা থেকেই যারা আমার বন্ধু তাদের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। তারা কী সবাই লোক হয়ে গেছে? এক বন্ধু বিদেশ থেকে ফরাসি বউ নিয়ে এসেছে, এক বন্ধু বিদেশে গিয়ে থেকেই গেল, আর ফিরবেনা। চম্পাহাটিতে জমি কিনে কলোনি বানাচ্ছে এক বন্ধু। মানুষ খুন করে আর-একজনের যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। একজন তার সদ্য জম্মানো মেয়ের গল্প করে সবসময়, আর-একজন তার সদ্য কেনা মোটরগাড়ির। একজন দুহাজার টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে, আর-একজন আজন্ম বেকার, কেউ ঠিকসময় খায় ঠিকসময় বাড়ি ফেরে, কেউ কখনো ফেরে কখনো ফেরেনা—অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, কেউ ছেলেবেলার হাসিখুশি মুখ এখন দুঃখিত করেছে, কেউ শৈশবের নির্বোধ জড় খোলশ থেকে বেরিয়ে এসে হতে পেরেছে সরকারি অফিসার। যে-মেয়েটিকে ভাবতাম রোগা হতে-হতে একদিন বাতাসে উড়ে যাবে, সে এখন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে, হেডমিস্ট্রেস সুলভ বিশাল বপু। (খুন করে যে যাবজ্জীবন জেল খেটেছে, তার কথা এমন সহজভাবে উল্লেখ করা আমার উচিত হয়নি। আমি এত নির্লিপ্ত নই। সেই সবচেয়ে আশ্চর্য? প্রত্যেক লোকেরই এমন বন্ধু থাকেনা। কলেজের গোড়া থেকে কুশলের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তাম। সে ছিল একটু রাগী বা একগুঁয়ে, যাকে বলা যায় আদর্শবান। তার মনের জোর ও ক্রোধ দেখে আমরা ভাবতাম, কুশল একদিন সত্যিই বড় হবে—আমরা সবাই কে কোথায় হারিয়ে যাব, মিশে যাব জনতায়, কিন্তু কুশল আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই কুশল ফিরে গেল কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দূরে নিজের গ্রামে, সেখানে হাস-মুরগি প্রতিপালন এবং সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আমাদের সাংবাদিক বন্ধুর কাছে কুশল প্রায় আসত ওর গ্রামের নানারকম খবর ছাপাতে। কুশলের নাম আলাদাভাবে দুবার কাগজে বেরিয়েছিল। মাঝরাত্রে দুটো চোরকে তাড়া করে প্রাণ বিপন্ন করে কুশল তাদের ধরেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সভা করে কুশলকে তার অসমসাহসিকতার জন্য সাধুবাদ

জানান এবং গ্রাম রক্ষার জন্য কুশলের নামে একটি বন্দুকের লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। সেই প্রথমবার। আবার। সেই কুশলই পাশেব বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে হঠাৎ রাগের মাথায় বন্দুক দিয়ে তাকে গুলি করে। আদালতে দোষ স্বীকার করেছিল বলে, তার ফাঁসী হয়নি, যাবজ্জীবন জেল হয়েছে। কোথায় কোন অন্ধকার জেলের ঘরে কুশল বসে আছে, তার সেই নির্ভীক মুখ এখন কুঁচকে গেছে কিনা কে জানে ! তার কথা আমার মনে আনা ঠিক হয়নি !)

আমার মনে হচ্ছে, এই যেসব মিশ্রিত স্বভাব বন্ধুবান্ধব, এদের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করলে মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই লোক। এসব ছেলেমানুষের কাণ্ড নয়। কিন্তু যখনই মুখ মনে করি যে-কোন একজনের, কিছুতেই সেই মুখের মধ্যে লোক-লোক ভাব খুঁজে পাইনা। সেদিন একটি আটবছরের ছেলে আমাকে ‘কাকাবাবু’ ডাকছে শুনে আঁতকে উঠেছিলাম প্রায়। কী সর্বনাশের কথা ! যে-ছেলেটি ডাকছে, পাশে দাঁড়ানো তার পিতৃদেব আমারই আবাল্যের বন্ধু। কিছুতেই আমার চেয়ে বয়েস বেশি হতে পারেনা। তাহলে, আমার এই বন্ধু নিশ্চয়ই লোক হয়ে গেছে। কারণ, ছেলের বাবা, কখনো নিজেও ছেলে হতে পারেনা। লোকেরই ছেলে হয়, কোন ছেলের ছেলে হওয়া একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ! হু, এতক্ষণে বুঝলাম, বিয়ে করলেই একটা ছেলে হঠাৎ একটা লোক হয়ে যায় !

নাঃ, এতেও কিন্তু সমস্যা মিটলনা। আবার ভেবে দেখলাম, ঐ আট বছরের ছেলেটির পিতা সমেত অন্যান্য বিবাহিত বন্ধুদের সম্বন্ধে যখন আড়ালে আলোচনা বা নিন্দে করি (বলা বাহুল্য, আড়ালে হলে নিন্দেই বেশি)—তখন তো কখনো বলিনা, আমার বন্ধু অমুক লোকটা..., বরং বলি, অমুক ছেলেটা একটা হাড়হারামজাদা...ইত্যাদি। ছেলেবেলা থেকেই যাকে ছেলে বলে ভেবে আসছি, তাকে কোনদিনই হঠাৎ লোক বলতে পারবনা। তাহলে কী, এইরকমই চলবে চিরকাল ? শৈশব থেকে একই সঙ্গে পাশাপাশি বাড়িতে পঞ্চাশ-ষাট-বছব ধরে আছেন, এমন দুই বৃদ্ধ কী পরস্পরের সম্বন্ধে আড়ালে উল্লেখ করেন ছেলেটা বলে ? এক পক্ককেশ বৃদ্ধ, তাঁর অপর সমবয়সী বন্ধু সম্পর্কে কী বলেন, আমার বন্ধু ঐ ছেলেটা ভাবী ..। এই দৃশ্যটা ভেবে আমি নিজেই একা-একা খুক-খুক করে হাসতে থাকি ? এতো ভারী গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। হঠাৎ এ সমস্যায় কেন জড়িয়ে পড়লাম ?

এরকমভাবে একা-একা হাঁটতে-হাঁটতে আমি বহুদূর চলে যাই। সন্ধে অনেক গাঢ় হয়ে এসেছে, মনে হয় যেন আমি পৃথিবীর আটদিকই ঘুরে এলাম। এখন আমি বাকি দুদিক—অর্থাৎ উপরে বা নিচেও ঘুরে আসা যায় কিনা যখন ভাবছি, সেইসময়েই একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। মুখ তুলে দেখি, আমারই এক বন্ধু।

সে বলে, কী রে, কোথায় যাচ্ছিস? আমি তো তোর ওখানেই আসছিলাম।

আমি অপ্রসন্ন মুখে বললুম, আমি আবার যাচ্ছি কোথায়? আমিই তো এদিকটায় আসছিলাম, তুই যেতে-যেতে ধাক্কা দিলি!

সে অবাক হয়ে বলল, সে কী! তুই-ই তো আনমনে এদিকে কোথায় যেন যাচ্ছিলি, আমিই বরং হন্তদন্ত হয়ে আসছি তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য!

আমি মুখ কালো করে বললুম মোটেই না, আমিই আসছি, তুই যাচ্ছিস। বন্ধুটি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে হো-হো করে হেসে বলল, তোর হয়েছে কী আজ? আচ্ছা, এখন তো আমরা কেউই আসছি বা যাচ্ছিনা। এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, সেই ভালো, আয় এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি মাঝপথে। অনেকক্ষণ—অন্তত যতক্ষণ পারা যায়।

১৪

বন্ধু আর বন্ধুপত্নী রেস্তরায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। আরেঃ, কী খবর! কতদিন পর দেখা...এসো একসঙ্গে চা খাই!

চায়ের আগে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পরে নানান কথাবার্তা। এতদিন অন্ধকারের পর রাস্তার ইলেকট্রিকের আলো এখন দ্বিগুণ উজ্জ্বল। বন্ধুপত্নী প্রশ্ন করলেন, পুজোয় কোথাও বাইরে যাচ্ছেন?

উত্তর দেবার বদলে আমি ইহুদীদের কায়দায় পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনারা?

শরৎকালে সব মেয়েরাই সুন্দরী হয়ে ওঠে। পুজোর ঠিক আগের কয়েকটা দিন এত সুন্দরী মেয়ে যে কলকাতার রাস্তায় কোথা থেকে আসে ভেবে পাইনা। কলকাতা শহরের পথ আমার কোনদিন একটুও সুন্দর লাগেনি, অথচ এই সময়টা সারা শহর উজ্জ্বল, ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে হঠাৎ সুন্দরী হয়ে উঠে পথ আলো করছে। প্রত্যেকের মুখে অস্পষ্ট নীল ছায়া। চোখে চকচক করে কৌতুক। পথের যে-কোন নারীর দিকেই তাকিয়ে আমি তাঁকে 'বিশ্বসুন্দরী' আখ্যা দিয়ে বসি মনে-মনে। এই বন্ধুপত্নীকে আমি কোনদিন উল্লেখযোগ্য ভাবিনি, অথচ আজ ওঁকে এমন রূপসী দেখাচ্ছে যে, অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তিনি অভূতপূর্ব মধুর হাস্যে বললেন, আগে ঠিক ছিল কাশ্মীর যাব...। কিন্তু, জব্বলপুর যাচ্ছি!

—জব্বলপুর! কোথায় থাকবেন?

—বাঃ, আপনি জানেননা, আমার ছোট ননদের বিয়ে হয়েছে ওখানে...

বন্ধু বললেন, তুই তো চিনতিস আমার বোন ললিতাকে?

আমি অস্পষ্ট স্বরে বললাম, হুঁ! ওর বিয়ে হয়ে গেছে জানতামনা!

—ওর স্বামী ওখানকার গান-শেল ফ্যাক্টরির বিরাট অফিসার। চমৎকার কোয়ার্টার আছে, খাবার-দাবার এখনো ভালো পাওয়া যায় শুনেছি। মাংস আড়াই টাকা কিলো, আর নর্মদার মাছ—

বাঃ চমৎকার! আমি তাহলে আজ চলি!

আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে জব্বলপুরে। জ্যোৎস্নায় মার্বেল রক দেখবেন। ললিতা খুব খুশি হবে।

—নাঃ! গেলে খুব ভালো লাগত নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার অন্য জায়গায় যাবার কথা আছে। দুমকায় আমার এক বন্ধুর কাছে। হরিণের মাংস খাওয়াবে বলেছে!

—হরিণের মাংস এমন কিছু সুখাদ্য নয়।

দুমকায় আমার কোন বন্ধু নেই। হরিণের মাংস খাবার ইচ্ছে আমার সারাজীবনে হয়নি। যে-প্রাণী দ্রুত দৌড়োয় তার মাংস খেতে ভালো হয়না জানি। কিন্তু মেয়েদের সামনে আমি অনায়াসে অভাবনীয় মিথ্যে চট করে বানিয়ে বলতে পারি। দেখলাম, জব্বলপুরের তুলনায় আমার দুমকা ও হরিণের মাংসের সম্ভাবনা খুব খারাপ হয়নি, ওঁদের দুজনের মুখই আলতোভাবে ঈর্ষাকাতর।

ছোট মাসিমার ছেলের অসুখ, তাই নিয়মরক্ষার জন্য দেখতে গিয়েছিলাম। বিয়ে কিংবা অসুখ না-থাকলে আত্মীয়স্বজনদের মুখ দেখার সুযোগ হয়না। নিমকি ভাজা ও চা খেতে-খেতে মাসিমার ছেলের রোগ বিষয়ে খুবই দুশ্চিন্তা দেখালাম। ওঁরা কিন্তু সবাই পরশুদিন গোপালপুর যাবার বিষয়ে আলোচনা করছেন। গোপালপুর-অন-সী। মাসিমা বললেন, তুইও আয় না আমাদের সঙ্গে! সমুদ্রের ওপরেই খুব বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, রান্না করার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে যাচ্ছি —চল, তোরও হাওয়া বদল হয়ে যাবে!

—নাঃ, গোপালপুরে কী যাব! বাজে জায়গা—কিছু দেখার নেই! খালি সমুদ্র আর সমুদ্র আর আঁশটে গন্ধ!

—সে কিরে! গোপালপুর চমৎকার জায়গা, ভিড় হয় না! পমফ্রেট আর গলদা চিংড়ি মাছ যা পাওয়া যায়!

—না ছোটমাসি। আমি জব্বলপুর যাচ্ছি। ওখানে জ্যোৎস্নায় মার্বেল রক দেখা, তার তুলনা হয় নাকি!

—জব্বলপুর যাচ্ছিস? থাকবি কোথায়?

—আমার বন্ধু ওখানে গান-শেল ফ্যাক্টরির বড় অফিসার। চমৎকার কোয়ার্টার আছে—ওর স্ত্রীকেও আমি আগে থেকে চিনতাম—খুব করে যেতে লিখেছে, না গেলে...

তিনজন লেখকবন্ধু যাচ্ছেন কোনারক। রেলের একটা কী কনসেশন জোগাড় করেছে চারজনের—সুতরাং আর-একজন সঙ্গী খুঁজছেন তাঁরা। দুদিন ভুবনেশ্বরে থেকে কোনারকেই ওঁরা থাকবেন আরো পাঁচদিন। সকলেই অবিবাহিত! আমি বললুম, যত পাগলের কাণ্ড! কোনারকে কেউ থাকে নাকি? ওখানে লোকে. সকালে দেখতে যায়, বিকালে ফিরে আসে। থাকার জায়গা পাবি কোথায়? ডাকবাংলোয় জায়গা পাওয়া যায়না, গভর্নমেন্টের একটা হোটেল আছে, তার একদিনের চার্জ পঁচিশ টাকা। আর কিচ্ছু নেই! মাঠে শুতে হবে, দেখিস।

—অত কাঁচা কাজ করি নাকি? ওখানকার মিউজিয়মে কাজ করে আমাদের বন্ধু অমুক। তার বাড়ি আছে। পুজোর সময় সে ফ্যামিলি নিয়ে কলকাতায় আসছে, তাকে আমাদের একজনের বাড়িতে থাকতে দেব। আর ওর ওখানে থাকব আমরা। ঐ সমস্ত বিখ্যাত মূর্তি বারবার দেখা হবে—সকাল, দুপুরবেলা, এমনকী রাত্তিরে, প্রত্যেকদিন—ভেবে দ্যাখ।

—না, ভাই, আমি যাচ্ছি গোপালপুর। সব ঠিকঠাক।

—গোপালপুর-অন-সী?

—হ্যাঁ! বাড়িভাড়া নেওয়া আছে। একা থাকব। তোমাদের ঐসব পাথরের মূর্তি সারাদিন দেখা আমার সহ্য হবেনা। আমি গোপালপুরে সারাদিন সমুদ্রে গা ডুবিয়ে পড়ে থাকব—পমফ্রেট আর চিংড়িমাছ খুব সস্তা—

কিন্তু কোনারকের পরিকল্পনাই আমার বেশি পছন্দ হল। না গিয়েই আমি কল্পনায় নিজেকে দেখতে পেলাম কোনারকের ভগ্ন মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো, একজোড়া নরনারীর মূর্তির দিকে চেয়ে আছি। রাত্তিবেলা আবছা অন্ধকারে আমি যেন ঘুরছি মন্দিরের চত্বরে।...বাসে দেখা হল চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে, পুজোর বাজার সেরে সপরিবারে ফিরছেন। আমাকে দেখে বললেন, কী হে, তুমি তো সেই বইটা নিতে আর এলে না? আমি তো আবার কালকেই চলে যাচ্ছি—

—কোথায়?

—মধুপুর। বাড়িসুদ্ধ সব। একমাস থাকব।

আমি মুখে একটা সূক্ষ্ম ব্যাঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বললুম, মধুপুর! ওঃ!—চন্দ্রনাথবাবুর দুই মেয়ে মণিমালা আর রত্নাও বাবার সঙ্গে রয়েছে—আমি ওদের দিকেই চোখ ফেলে ওরকমভাবে মধুপুর কথাটা উচ্চারণ করি। অর্থাৎ আমার মুখে ফুটে ওঠে, ওঃ, মধুপুর, সেই কলকাতার ভিড়, সেই চেনা মুখ, যেখানেই যাও ঘুরে-ফিরে স্টেশনের কাছে হাজির হওয়া, দুধের সর-পড়া চা—ওখানে আবার মানুষে যায়!

—তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি!

—হ্যাঁ, কোনারক।

—কোনারক? থাকার জায়গা আছে?

—হ্যাঁ। বন্ধুর বাড়ি আছে—টানা সাতদিন থাকব—মন্দিরটা খুব ভালো করে দেখব এবার, প্রত্যেকটা মূর্তি দেখে-দেখে নোট করে আনার ইচ্ছে আছে!

চন্দ্রনাথবাবু একজন শিল্পবিশারদ। কিন্তু মেয়েদের সামনে কোনারক বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাইলেননা। শুধু বললেন, ইন্টারেস্টিং! আচ্ছা, ফিরে এসে দেখা ক'রো। শুনব!

বাস থেকে নেমে বাড়ির গলিটা অন্ধকার। কেউ নিশ্চয়ই বালব চুরি করেছে। ঐটুকু পথ হাঁটতে-হাঁটতে আমি চকিতে বহু জাগয়া ঘুরে এলাম। হরিণভরা দুমকার জঙ্গল। জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়ে জ্যোৎস্না। গোপালপুরের সমুদ্র—রাত্রে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলে। কোনারকের বিস্ময়কর মন্দির। এমনকী মধুপুরের লাল রাস্তায়ও একপলক হেঁটে এলাম।

আমি কোথাও যাবনা। আমি এই গলিতেই থাকব।

আমিও চলে গেলে, কলকাতা ছেড়ে যারা গেলনা, সেই সব সাময়িক বিশ্বসুন্দরীদের রূপের তারিফ করবে কে?

১৫

সকালবেলা কোকিলের ডাকে আমার ঘুম ভাঙে এবং রাত্রে ঝিল্লিরব আমায় ঘুম পাড়ায়। এই লাইনটা পড়েই পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমার মতন অকবিও শেষপর্যন্ত কাচা কবিত্ব করতে শুরু করেছে। কিংবা আমি বোধহয় গজদন্তমিনারে বাস করছি। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই।

নোংরা শহরতলীর যে ফ্ল্যাটবাড়িতে আমি থাকি—তার চারপাশে অনেকখানি খোলা জায়গা। সেখানে অযত্নে বর্ধিত অনেকগুলো আম, নিম, বেল, নারকেল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। আর সেই গাছে-গাছে অসংখ্য পাখি। পাখির মধ্যে অবশ্য কাকই বেশি আর যেখানে কাকের বাসা—তার কাছাকাছি কোকিলও থাকবে। এছাড়া শালিক আর ছাতারে আর চড়ুইয়ের পাল, মাঝে-মাঝে উড়ন্ত টিয়ার ঝাঁক, ক্বচিৎ কখনো ইস্টকুটুম, দোয়েল, বুলবুলি, মুনিয়া আর দুর্গা টুনটুনিও দেখতে পাই। পাখির ডাক না-শুনে আমার একটি মুহূর্তও কাটার উপায় নেই।

কিন্তু পাখিরা বিষম অকৃতজ্ঞ। তাঁদের দয়ামায়া কিছুই নেই, আমি লক্ষ করেছি।

যেমন কাকের কথাই ধরা যাক। কাক কেউ পছন্দ করেনা। বনফুলের উপন্যাসের করালী ছাড়া আর কেউ কোনদিন কাক ভালোবেসেছে—এমন কখনো দেখিনি, শুনিনি। কাক অলক্ষ্মী, অশুভ। নির্জন দুপুরবেলা কাকের ডাক শুনলে গা ছমছম করে, মনে হয় পৃথিবীর কোথাও সেই মুহূর্তে মহাবিপদ ঘটে যাচ্ছে। তবু কাকেদের ওপর আমার মায়া পড়েছিল।

আজকাল ভাত কেউ ফেলে দেয়না, মাছও যেটুকু বাজার থেকে আসে—রান্নার পর তা প্রায় কাঁটাশুদ্ধুই চিবিয়ে খাওয়া হয়। তাহলে কাকেরা খাবে কী? এই নিয়ে মাঝখানে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের বাগানে গোটা তিরিশেক কাক আছে—তাদেব বাঁচিয়ে রাখা তো দরকার। জীব দিয়েছেন যিনি, তিনি আজকাল আর আহার জুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননা। কাকেদের জন্য চিন্তা করেও আমি কোন সুরাহা করতে পারছিলামনা। কিন্তু আকস্মিক সুযোগ এসে গেল। মাঝখানে কিছুদিন কলকাতা থেকে পাঁউরুটি উধাও হয়ে গেল। তখন সকালবেলা জলখাবারের জন্যও ববাদ্দ হল হাতে-গড়া রুটি। দুপুরে রুটি, রাত্রিরে রুটি আবার সকালের জলখাবাবেও রুটি—ভূতপূর্ব বাঙালের পক্ষে এতখানি সহ্য করা সম্ভব নয়। আমি সকালবেলার জলখাবারের রুটিগুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কাকদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগলাম। তিরিশটা কাক তাদের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাইকে ডেকে এনে জড়ো করল—সেই দৃশ্য দেখবার মতন, শূন্যে একটুকরো রুটি ছুঁড়ে দিই, আর শূন্যপথেই সেটা লুফে নেবার জন্য একপাল কাক ঝটাপটি করে শেষ পর্যন্ত যে-পায়-তার চোখে-ঠোঁটে কী গর্ব। সবগুলোর মধ্যে একটা কাক ভারী চালাক আর সবচেয়ে শক্তিশালী—বেশিরভাগ টুকরো সে একাই পায় —দু-একটা আবার অন্যদের বিলিয়ে দেয়।

সকালবেলা কাক-ভোজন করিয়ে বেশ মজা পাচ্ছিলাম—কিন্তু ক্রমশ ঐ কাকগুলো আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলল। গাছ ছেড়ে ওরা বারান্দার রেলিং-এ বসা শুরু করল, ক্রমশ বারান্দা ছেড়ে ঘরে। আমাকে মানুষসমাজের সবচেয়ে বোকা লোক মনে করে ওরা আমার ঘরবারান্দা সবকিছু নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিল। আমার খাটের নিচে, আলমারির মাথায় সব জায়গায় ওদের উপদ্রব। যে-কোন খাবারে ওরা মুখ দেবে, দুধের ঢাকনা উল্টে ফেলে তাতে ঠোঁট ডোবাবে, এমন কী খোলাসুদ্ধ আস্ত ডিমও মুখে করে নিয়ে যায়। অসহ্য হওয়ায় শেষপর্যন্ত আমি গুলতি কিনলাম। সবাই বললে, খবর্দার, কাক মেরো না, একটা কাক মারলে বাকিরা তোমার চুল খুবলে নেবে, চোখ অন্ধ করে দেবে। কাকেদের ওপর আমার মহাক্রোধ জেগেছিল। আমি ইঁদুর-মারা-বিষ মেশানো খাবার ছড়িয়ে তিনটে কাককে মারলাম—তাতে ওরা বুঝতেও পারলনা কে ওদের হত্যাকারী—আর জাল

দিয়ে বারান্দা থেকে শুরু করে ঘরের সবক'টা জানলা ঘিরে দিয়েছি।

তারপর কোকিল। কোকিল মানুষের কাছাকাছি আসেনা। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙল কোকিলের ডাক শুনে ! আমগাছটার ঘন পাতার আড়াল থেকে একটা কোকিল বাহার রাগে কুহুতান ধরেছে ! মনটা খুশি হয়ে গেল। আমি সেই নরম আলোময় ভোরবেলায় স্নিগ্ধ বাতাস মুখে মেখে জানলা দিয়ে তাকালাম। আমগাছের ডগায় সেই কোকিলটাকে দেখা গেল, আমি তার উদ্দেশ্যে বললুম, বাঃ বেশ চমৎকার। আর-একখানা গান কবো তো হে ! সে আবার কুহুরব তুলল, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের পাশের ফ্ল্যাট থেকে খাঁচার কোকিলটাও ডেকে উঠল। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকরা দুমাস আগে এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন ঐ কোকিলটা—সেটা কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে থাকত, কোনদিন একটু সাড়া-শব্দ করেনি—এই প্রথম তার ডাক শুনলাম। বনের পাখি আর খাঁচার পাখি এক সুরে ডাকছে—এই ব্যাপারটায় আমার কীরকম যেন একধরনের সেন্টিমেন্টাল কষ্ট হল। আমি পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের অনেক অনুরোধ করে সেই কোকিলটার মুক্তি দেওয়ালাম। তারপব থেকে শুরু হল দুই কোকিলের পাল্লা দিয়ে ডাকাডাকি সেই আমগাছের মাথায়। কখনো উড়ে যায়, আবার ফের এসে বসে। প্রথম-প্রথম আমাদের খুব মজা লাগত। বাড়িতে লোকজন বেড়াতে এলে আমরা তাঁদের সেই খাঁচার কোকিল আর বনের কোকিলের কাহিনী বলে সেই কোকিলের ডাক শোনাতাম। তারপব ক্রমশ কান ঝালাপালা হয়ে এল। সকাল-দুপুর-সন্ধে জুড়ে অনবরত কোকিলের ডাক শুনতে কারুর ভালো লাগেনা। নানান সময় নানারকম মুড থাকে—সব সময় চোখ বুঁজে কোকিলের দিকে কান ফেরানো যায়না ! পুরুষ কোকিল কুহু স্বরে ডাকেনা, তাদের রংও কালো হয়না। সুতরাং ঐ দুটিই মেয়ে কোকিল ওদের অত ভাব কিসের ? ওরা যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ডেকে গলা ফাটাতে লাগল। আমি একদিন জানলা দিয়ে মুখ বার করে ওদের বললাম, গান যে ঠিক সময়ে থামাতে জানেনা—সে মোটেই ভালো গাইয়ে নয়। এবার বাপু গান থামাও। ওরা কথা শুনলনা। বসন্তকাল ফুরিয়ে প্রখর গ্রীষ্ম তখন সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর কোকিলের ডাক এমনকী তারপর বর্ষাকাল, সেসময় কোকিলের ডাকার কথা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই। একটা সুন্দর শ্লোক পড়েছিলাম ছেলেবেলায়—বর্ষাকালে কোকিল ডাকে না কেন ? কারণ, বর্ষাকালে ব্যাঙেরা সমস্বরে ডাকতে শুরু করে—তখন কোকিলের চুপ করে থাকাই উচিত। 'মূর্খেরা যখন বক্তা বুদ্ধিমানের পক্ষে তখন নীরব থাকাই যেন শ্রেয়।' কিন্তু ঐ কোকিলদুটো সেই শ্লোকের কথা জানেনা—একেবারে গোমুখ্যু যাকে বলে—সারা বছর ধরে ডেকে-ডেকে আমাকে কোকিলের ডাক সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে তুলল।

শালিকঘটিত ব্যাপারটা অন্যরকম। শালিকগুলিকে দেখতে বেশ সুন্দর, বুদ্ধিমানও খুব। আমাদের বাগানের শালিকগুলোর ভয়ডর নেই, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়—মাঝে-মাঝে দল বেঁধে কাকদের সঙ্গে ঝগড়া করে, গাছে বিড়াল উঠলে তাদের ল্যাজে ঠোক্কর মেরে তাড়ায়। শালিকগুলোর মধ্যে দুটি শালিক আমার খুব প্রিয়। একটি শালিকের মাথায় কালো রঙের ছোপটি এমন, যেন মনে হয় খুব কায়দায় চুল আঁচড়ানো। আমি ওর নাম দিয়েছি শালিক উত্তমকুমার। আর-একটির চোখদুটো খুব টানাটানা—আমি ওর নাম সুচিত্রা সেন কিংবা সুপ্রিয়া চৌধুরী রাখব এখনো ঠিক করতে পারিনি। বারান্দা জাল দিয়ে ঘেরা সত্ত্বেও ওরা ঘুলঘুলির কাচ দিয়ে বাথরুমের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের উপদ্রব বেশি নয় বলে আমি অপছন্দ করিনি।

একদিন দেখলাম, বাগানে কতকগুলো বাচ্ছা ছেলে একটা শালিকের পায়ে দড়ি বেঁধে খেলছে। আমি চমকে উঠলাম, আরেঃ এতো সেই উত্তমকুমার। আহা, অমন শৌখিন পাখিটার এই দৃশ্য ! ছেলেগুলো আম পাড়তে গাছে উঠেছিল—সেখানে শালিকের বাসা দেখে ভাঙতে যায়, তখন এই উত্তমকুমার শালিক এসেছিল ওদের ঠোকরাতে। সুতরাং ছেলেরা ওকে ধরে ফেলে পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে। আমি ছেলেগুলোর কান মুলে দিয়ে হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে শালিকটাকে মুক্তি দিলাম। শালিকটা পিড়িং করে ডানার শব্দ করে উড়ে গেল। অন্য একঝাঁক শালিক সমস্বরে কোচাটু পিসাটু বলে আমায় কৃতজ্ঞতা জানাল।

এর ফলাফল কিন্তু করুণ। একদিন আমাদের দোতলার বাথরুমে একটা সাপের খোলস দেখতে পাওয়া গেল। বাড়িসুদ্ধ সবাই আঁতকে উঠলাম। দোতলায় সাপ ! খোলস ছেড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে ? বাড়ির সকলে চিন্তায় অস্থির, অবিলম্বে এ বাড়ি বদলাতে হবে। তাহলে সব ঝামেলা আমারই। আবার বাড়ি খোঁজ মালপত্তর টানা ! সুতরাং আমি তন্ন-তন্ন করে সাপ খুঁজতে লাগলাম। বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে রহস্যটা পরিষ্কার হল। চৌবাচ্চার জলে আর-এক টুকরো সাপের খোলস। বাথরুমের ঘুলঘুলিতে একজোড়া শালিক এসে বাসা বাঁধছে—সেই উত্তমকুমার তার সুচিত্রা বা সুপ্রিয়া ! নানান নোংরা জিনিশ—নারকেল দড়ি, ঝাঁটার কাঠি, ময়লা কাগজ ইত্যাদি মুখে করে আনছে শালিকদুটো বাসা বাঁধবার জন্য। সাপের খোলসও ওরাই এনেছিল—সেটাই উড়ে পড়েছে। উপকারের প্রতিদান ! ক্রমশ বিচিত্র সব নোংরা পদার্থ বাথরুমে উড়ে পড়তে লাগল—কখনো জলের মধ্যে, কখনো আমার মাথায়। বাড়িতে শালিক পাখির বাসা—অসম্ভব, আমি উপকার করেছি কিনা—তাই আমার ওপর যা খুশি অত্যাচার করা যায়। কিন্তু স্নানের জলে সাপের খোলস কে সহ্য করবে ? আমি প্রথমে হাততালি দিয়ে হুস-হুস

শব্দ করে ওদের ওড়াবার চেষ্টা করলাম। যাবে না। তারপর ঝুলঝাড়া দিয়ে ওদের তাড়া করলাম—কিন্তু এমনই আবদার তখন-তখন উড়ে যাচ্ছে—কিন্তু একটু বাদেই আবার ফিরে আসছে। শেষপর্যন্ত যখন একটা থ্যাংলানো ইঁদুর ওরা মুখে করে এনে জলে ফেলল—তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। সন্ধেবেলা ওরা ঘুলঘুলিতে এসে আশ্রয় নেবার পর, আমি মই লাগিয়ে চুপি-চুপি উঠে ক্যাঁক করে ওদের ধরে ফেললাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে—

শালিকের রোস্ট বেশ সুস্বাদু। মাংসটায় একটু ছিবড়ে হয়। কিন্তু চিলি সস দিয়ে মাখিয়ে নিলে চমৎকার। এখনো জিভে লেগে আছে।